অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩২৯ সালে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পূর্ব্ববঙ্গীয় কুমিল্লা-জেলার অন্তর্গত নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিটঘর, বিদ্যাকূট এবং কমলাসাগর হাইস্কুলের ছাত্রদের নিকটে অজস্র পত্র লিখিয়াছিলেন। এক একটা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তিনি ধারাবাহিক ভাবে ইহাদের নিকটে পত্র পাঠাইতেন। অজ্ঞাত অপরিচিত স্থান হইতে হঠাৎ পত্র পাইয়া কিশোরগণ অনেক সময়ে অনুধাবন করিতে পারিত না যে, এই সকল পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য কি ? অধিকাংশ পত্রেই লেখকের স্বাক্ষর থাকিত না এবং প্রত্যেকখানা পত্র স্বকীয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে দেখাইয়া আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ থাকিত।

সেই সকল পত্র-মধ্যে কতক পত্রের অংশবিশেষের অনুলিপি রক্ষা করা হইয়াছিল। তাহারই কতক একত্র করিয়া ১৩৩০ সালে "প্রবুদ্ধ যৌবন" নামে প্রকাশিত হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র-সমাজে ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। পুস্তিকাখানার বহুবার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে, কিন্তু কতবার হইয়াছে, আমরা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। যতটুকু মনে পড়ে, ইহা বিভিন্ন ভাবে পর পর ছয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। মুদ্রণের হিসাবে ধরিলে ইহা এই গ্রন্থের সপ্তম মুদ্রণ। সংস্করণের হিসাবে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ, কারণ এইবার পুস্তকখানা পরিবর্দ্ধিত হইল।

ব্রহ্মচর্য্য-পালন আবশ্যক কিনা—অথবা গৃহস্থের পুত্রকন্যারা কৈশোরে যৌবনে যে যেমন চলিতেছে, তাহাকেই স্বাভাবিক জীবন মনে করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকাই ভাল, খুব সম্প্রতি এই জাতীয় বিতর্ক শোনা যাইতেছে। যে সময়ে "প্রবুদ্ধ যৌবন" রচিত হইয়াছিল, সেই

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩২৯ সালে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পূর্ব্ববঙ্গীয় কুমিল্লা-জেলার অন্তর্গত নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিটঘর, বিদ্যাকূট এবং কমলাসাগর হাইস্কুলের ছাত্রদের নিকটে অজস্র পত্র লিখিয়াছিলেন। এক একটা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তিনি ধারাবাহিক ভাবে ইহাদের নিকটে পত্র পাঠাইতেন। অজ্ঞাত অপরিচিত স্থান হইতে হঠাৎ পত্র পাইয়া কিশোরগণ অনেক সময়ে অনুধাবন করিতে পারিত না যে, এই সকল পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য কি? অধিকাংশ পত্রেই লেখকের স্বাক্ষর থাকিত না এবং প্রত্যেকখানা পত্র স্বকীয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে দেখাইয়া আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ থাকিত।

সেই সকল পত্র-মধ্যে কতক পত্রের অংশবিশেষের অনুলিপি রক্ষা করা হইয়াছিল। তাহারই কতক একত্র করিয়া ১৩৩০ সালে "প্রবুদ্ধ যৌবন" নামে প্রকাশিত হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র-সমাজে ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। পুস্তিকাখানার বহুবার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে, কিন্তু কতবার হইয়াছে, আমরা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। যতটুকু মনে পড়ে, ইহা বিভিন্ন ভাবে পর পর ছয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। মুদ্রণের হিসাবে ধরিলে ইহা এই গ্রন্থের সপ্তম মুদ্রণ। সংস্করণের হিসাবে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ, কারণ এইবার পুস্তকখানা পরিবর্দ্ধিত হইল।

ব্রহ্মচর্য্য-পালন আবশ্যক কিনা—অথবা গৃহস্থের পুত্রকন্যারা কৈশোরে যৌবনে যে যেমন চলিতেছে, তাহাকেই স্বাভাবিক জীবন মনে করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকাই ভাল, খুব সম্প্রতি এই জাতীয় বিতর্ক শোনা যাইতেছে। যে সময়ে "প্রবুদ্ধ যৌবন" রচিত হইয়াছিল, সেই

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩২৯ সালে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পূর্ব্ববঙ্গীয় কুমিল্লা-জেলার অন্তর্গত নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিটঘর, বিদ্যাকূট এবং কমলাসাগর হাইস্কুলের ছাত্রদের নিকটে অজস্র পত্র লিখিয়াছিলেন। এক একটা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তিনি ধারাবাহিক ভাবে ইহাদের নিকটে পত্র পাঠাইতেন। অজ্ঞাত অপরিচিত স্থান হইতে হঠাৎ পত্র পাইয়া কিশোরগণ অনেক সময়ে অনুধাবন করিতে পারিত না যে, এই সকল পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য কি ? অধিকাংশ পত্রেই লেখকের স্বাক্ষর থাকিত না এবং প্রত্যেকখানা পত্র স্বকীয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে দেখাইয়া আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ থাকিত।

সেই সকল পত্র-মধ্যে কতক পত্রের অংশবিশেষের অনুলিপি রক্ষা করা হইয়াছিল। তাহারই কতক একত্র করিয়া ১৩৩০ সালে "প্রবুদ্ধ যৌবন" নামে প্রকাশিত হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র-সমাজে ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। পুস্তিকাখানার বহুবার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে, কিন্তু কতবার হইয়াছে, আমরা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। যতটুকু মনে পড়ে, ইহা বিভিন্ন ভাবে পর পর ছয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। মুদ্রণের হিসাবে ধরিলে ইহা এই গ্রন্থের সপ্তম মুদ্রণ। সংস্করণের হিসাবে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ, কারণ এইবার পুস্তকখানা পরিবর্দ্ধিত হইল।

ব্রহ্মচর্য্য-পালন আবশ্যক কিনা—অথবা গৃহস্থের পুত্রকন্যারা কৈশোরে যৌবনে যে যেমন চলিতেছে, তাহাকেই স্বাভাবিক জীবন মনে করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকাই ভাল, খুব সম্প্রতি এই জাতীয় বিতর্ক শোনা যাইতেছে। যে সময়ে "প্রবুদ্ধ যৌবন" রচিত হইয়াছিল, সেই

সময়ে এমন কুতর্ক শোনা যাইত না। সেই সময়ে দেশের প্রত্যেকটী চিন্তাশীল ব্যক্তির লক্ষ্য ধাবিত ছিল জাতীয় পরাধীনতার অবসানকল্পে উপায়-নির্ণয়ে ও পন্থাবলম্বনে। সেই সময়ে জীবন ও জীবন-যাপন-প্রণালী সম্পর্কে উন্নত আদর্শবাদের প্রয়োজনীয়তা-বোধ দেশের খ্যাত-অখ্যাত প্রায় প্রত্যেক মনস্বী ব্যক্তির মনে জাগিয়াছিল। তাই "প্রবুদ্ধ যৌবন" নানারূপে বারংবার মুদ্রণ আবশ্যকীয় হইয়াছিল। বাংলার যুবকগণকে যাঁহারা স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করিয়াছিলেন, তাঁহারা চরিত্রের সাধনাকে প্রধান প্রয়োজনীয় বলিয়া অন্তরে অন্তরে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকে চরিত্র-সাধনার সবচেয়ে বড় কথা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

সে বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত করিবার মত যোগ্য বা সঙ্গত কারণ কিছু এখন পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশের রতি-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণের রচিত যৌনতত্ত্ব-সম্পর্কিত রাশি রাশি গ্রন্থ ভারতে আমদানী হইতেছে এবং তাহা পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় বহু পাঠক নিম্নলিখিত দুইটী ধারণার দ্বারা আবিষ্ট হইতেছেন। যথা,—(১) যৌবনে ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রস্খলন পাপও নহে, ক্ষতিকরও নহে, (২) বিবাহিত জীবনে যে গণনাতীত অশান্তি, তাহার মূল হইতেছে যৌন-তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষার অভাব। এই দুইটী ধারণার মধ্যে শেষেরটী সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কেননা যৌন-তত্ত্ব আলোচনারই অযোগ্য বলিয়া পরিহার করার ফলে অজ্ঞ নরনারী-গুলিই পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে এবং অশেষ অশান্তি ভোগ করিতেছে। কিন্তু প্রথমোক্ত কারণটী সত্য সত্যই ভিত্তিহীন এবং সর্ব্বনাশকর। যাহাতে কিশোর ও যুবক-সমাজের মধ্য হইতে

নিবেদন

ইচ্ছাকৃত বীর্য্যস্খলনের কদভ্যাস দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা জাতি-ধ্বংস নিবারণের জন্যই একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য রতিশাস্ত্রবিদেরা কি বলিতেছেন, তাহা আমাদের শুনিবার প্রয়োজন নাই। শীতপ্রধান দেশে যাহা হয়ত ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় না, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাই মারাত্মক। প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যকে অতি উচ্চ সম্মান দিয়াছিলেন, আমরাও ব্রহ্মচর্য্যকে সেই সম্মান দিব। ব্রহ্মচর্য্যই ভারতীয় জীবনের মূল ভিত্তি,—সংসারে, সন্ন্যাসে, ভোগে, ত্যাগে, কৈশোরে, প্রৌঢ়ে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে ব্রহ্মচর্য্যই ভারতীয় জীবনের চির-প্রশংসিত আদর্শ। এই আদর্শের সহিত মিল রাখিয়া জীবন-পরিচালনাই শাশ্বত কালের ভারতীয় জীবন।

অবশ্য, এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, শুক্রক্ষয়ের ও কাম-চর্চ্চার কুপথে যাহাতে জাতীয় শক্তি অপচয়িত হইয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বনাশ না ডাকিয়া আনে, তাহার জন্য ইয়ুরোপ ও আমেরিকার বহু মনস্বী পুরুষ ও নারী, কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রচারের জন্য বহু সংসাহিত্যও রচনা করিয়াছেন। এই সকল লেখক-লেখিকাদের মধ্যে উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত (১) চিহ্নিত মতবাদের প্রতি কোনও প্রশ্রয় বা পক্ষপাত নাই। তাঁহারা দ্বিধাহীন চিত্তে ভারতীয়গণের ন্যায় ইহাই বিশ্বাস করেন, যে গুপ্তপাপকে কিশোর ও যুবকদের মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া অবহেলা করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা অবহেলার যোগ্য নহে। তাহার প্রতিকারও অসম্ভব নহে। ইচ্ছাশক্তির সবলতা সাধনের দ্বারা প্রত্যেক বা অধিকাংশ কিশোর ও যুবক কৈশোরের প্রচ্ছন্ন পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। প্রয়োজন হইতেছে সময় থাকিতে প্রকৃত হিতকারী বান্ধবের

পবিত্রতার ভাবোদ্দীপক হিতোপদেশ এবং উৎসাহবাণী। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল যাবৎ কিশোর ও যুবকসমাজের মরমের মরমী, দরদের দরদী, ব্যথার ব্যথী হইয়া তাহাদের জীবনকে কলুষকালিমা হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই "অযাচক আশ্রম" তাঁহার প্রতিষ্ঠাতার রচিত সাহিত্যকে জন-সমাজে অবিরাম প্রচারিত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর। ইতি—৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬২।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

বিনীত নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

"প্রবুদ্ধ যৌবন" ষষ্ঠ সংস্করণ দীর্ঘ আট বৎসর পর প্রকাশিত হইল। পঞ্চম সংস্করণ ১৩৯১ সনের আশ্বিনে প্রকাশিত হয়। যে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ষোল বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সেই আন্দোলনই চতুর্দ্দিকে দেশের যুবক যুবতীদের কুশলের জন্য বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে বলিয়া "প্রবুদ্ধ যৌবনের" চাহিদাও বাড়িয়াছে। আশা করি ইহার প্রকাশের দ্বারা যুবক ভ্রাতাদের যৌবনশ্রী দেশের চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিবে। ইতি—মাঘ, ১৩৯৯ বাং

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১০

বিনীত—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

প্রবুদ্ধ যৌবন

প্রথম অধ্যায়

(১)

দেশের বালক ও কিশোর সম্প্রদায় প্রচ্ছন্ন পাপে প্রতিদিন উৎসন্নে যাইতেছে। কোনও অভিভাবক বা শিক্ষকের এই দিকে দৃষ্টি নাই, বুঝি বা অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্টি দিবার মত যোগ্যতাও নাই। মোহ-বিভ্রান্ত অভিভাবকেরা সন্তানের বুদ্ধির উৎকর্ষ ঘটাইতে যাইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার আলেয়ার আলো অনুসরণ করিতেছেন, গুরুভার পুস্তকাবলির উপরে গুরুতর গৃহশিক্ষকের শাকের আঁটি চাপাইয়া বালকদের নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসরটুকু বুদ্ধিহীনতার দোষে কাড়িয়া লইতেছেন এবং চরিত্র-সম্পদহীন, স্বাস্থ্যসামর্থ্যহীন, অপোগণ্ড শিশুগুলিকেও পরীক্ষার নম্বরের উপরে হাততালি বা বাহবা দিয়া দিয়া উন্নতিস্পর্দ্ধী মস্তকগুলিকে দৈহিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইতে নিরুৎসাহ করিয়া ঘাড়ে ধরিয়া নত করিয়া দিতেছেন। দুমুঠো উদরান্নের কাঙ্গাল শিক্ষকগণের শতকরা পঁচানব্বই জন নিমকের স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য 'বি-এল্-এ-ব্লে' ও 'সি-এল-এ-ক্লে'র গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রই প্রাণপণে একনিষ্ঠ-ভাবে জপ করাইতেছেন,—ছাত্রগুলিকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার তাঁহাদের যেন ঠেকাও নাই, গরজও নাই। আর এদিকে

অকালে বীর্য্যক্ষয় করিয়া রুগ্ন-দেহ ও রুগ্নমনা এই বালকের দল ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেন এক শ্মশানাতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে।

এই সকল বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী শুনাইয়া, আত্ম-সংযমের মহিমা বুঝাইয়া, আত্ম-অপচয়ের মৃত্যু-মলিন পথ হইতে ফিরাইয়া জীবনের সংগ্রাম-মুখর দিগ্বিজয়-সমুজ্জ্বল কর্ম্মাঙ্গনে আনিতে হইবে। ইন্দ্রিয়-সুখই যে চরম সুখ নহে, ইহার অতিরিক্ত যে বৃহত্তর সুখ মানুষের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং আত্মোৎ-সর্গের মধ্য দিয়া প্রসূত হয়, তাহা বুঝাইয়া ইহাদিগকে আত্মস্থ ও সুস্থ করিতে হইবে। ধর্ম্মভাবের প্রেরণা অনবরত দিতে দিতে ইহাদের মানসিক পঙ্গুতা বিনাশ করিয়া ইহাদের ভোগ-লিপ্সু জড়চিত্তে ত্যাগোৎসাহের বন্যা আনয়ন করিতে হইবে।

হে যুবকবৃন্দ! এই সকল কাজ আজ তোমাদের উপরেই ন্যস্ত হইতেছে। সর্ব্বথা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিয়া তোমা-দিগকেই দেশভ্রাতৃগণের মধ্যে উৎকর্ষ সঞ্চারিত করিতে হইবে। নিজে সৎ হইয়া অপরকে সৎ এবং নিজে সংযমী হইয়া অপরকে সংযমী হইতে শিখাইতে হইবে। নিজে মানবোচিত সদ্‌গুণাবলীতে অলঙ্কৃত হইয়া সকলকে তেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। দিন দিন তোমার সমাজ-বন্ধনের একটি একটি করিয়া রজ্জু অপরিণত-বয়সে বীর্য্যক্ষয়ের সুনিদারুণ

আঘাতে ছিঁড়িয়া যাইতেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, ওলাউঠা প্রকাশ্যভাবে যে ক্ষতি করিতেছে, জাতির ব্রহ্মচর্য্য-হীনতা অপ্রকাশ্যভাবে তাহার শতগুণ অকল্যাণ করিতেছে। এই অকল্যাণের বিরুদ্ধে আজ তোমাদিগকেই যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইবে।

নিজের শক্তিতে অবিশ্বাস না করিয়া যাহা-কিছু ক্ষীণ শক্তির সঞ্চয় তোমার আছে, তাহা লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। আত্মনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তোমার কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া মহাশক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারিবে। যত গুড়, তত মিঠা। ভাবের নিবিষ্টতা, আগ্রহের অকপটতা এবং চেষ্টার অবিরলতা যত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, ততই তোমার মধ্যে ব্রহ্মশক্তির উন্মেষ ঘটিতে থাকিবে।

অন্য শত শত প্রয়োজনের দাবী হয় ত' আমরা এখন অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের যে দাবী আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই পায়ে ঠেলিয়া যাইতে পারি না। সিংহ-শাবক আজ শৃগালের অধম হইয়া যাইতেছে, মহাবটের বীজে আজ ক্ষুদে কাঁটার বংশ বাড়িতেছে, এই দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? আজ দলে দলে কর্ম্মী চাই, দলে দলে প্রচারক চাই, দলে দলে আদর্শ-দাতা ত্যাগী পুরুষ এবং আদর্শপ্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীরগণের প্রয়োজন পড়িয়াছে। বিশ্বপূজিত ঋষি-মহর্ষির নিজ হাতে

রচা যে কল্যাণ-মন্দির ভারতের বংশধর আশ্রয় পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ছিল, তাহাতে আজ অসংযমের আগুন ধরিয়াছে। কে আছ কোথায়, ব্রহ্মচর্য্যের সলিল-সিঞ্চনে এই আগুন নিবাও, এ দহনের জ্বালা শান্ত কর। ভারতের সুকুমার শিশু ঐ আগুনে পুড়িয়া মরিল যে! যার যতটুকু সাধ্য আছে, ততটুকু জল-সিঞ্চন কর। কেহ নিজেকে একেবারে অক্ষম মনে করিও না। চির-অসমর্থ আছ যারা, তারাও একবারটী নিজেদের সুপ্ত শক্তির নূতন করিয়া পরখ লইয়া দেখ। দোহাই তোমাদের মনুষ্যত্বের, দোহাই তোমাদের আত্ম-মর্য্যাদার, অগ্রসর হও, রক্ষা কর, বাঁচাও।

(২)

জীবন অপেক্ষা এখন মৃত্যু সুলভ হইয়াছে, কিন্তু ইহাই দুর্ভাগ্য যে, এই মৃত্যু অক্ষমের মৃত্যু, সবল সাহসীর মৃত্যু নহে। হয় মৃত্যুকে দুর্ল্লভ করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যুকে বীরের মৃত্যুতে পরিণত করিতে হইবে ; নচেৎ জাতীয় ধ্বংসের গতি থামিবে না।

মরিবার মত যদি মরিতে শিখি, তাহা হইলে মৃত্যুসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেও জাতির সমূল ধ্বংস সাধিত হইতে পারিবে না। কারণ, যাহারা মরিতে জানে, তাহারা বাঁচিতেও জানে। আমরা আজ বাঁচিতে জানি না, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষার পীড়নে অধীর হইতে জানি না। তাই, আজ আমাদিগকে প্রথমেই বাঁচিতে শিখিতে হইবে। কিন্তু কেমনে বাঁচিব ?

ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়া দিনে দিনে এ জাতির সুপ্রজনন-শক্তি হ্রাস পাইতেছে, পুরুষেরা পুরুষত্বহীন এবং নারীরা বন্ধ্যা ও অর্দ্ধবন্ধ্যা হইতেছে। ছাত্রজীবনে বীর্য্যরক্ষা না করিয়া অবিবাহিত বালক ও যুবকেরা এবং হিতাহিতজ্ঞানবর্জ্জিত ছাগসুলভ কামাতুরতাহেতু বিবাহিতেরা নিত্যই নব দুর্ব্বলতা সঞ্চয় করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের অবাধ পরিতৃপ্তিই যে প্রকৃত সুখ নহে, সন্তানজনন ব্যাপারটী যে শুধু খেয়ালেরই কাজ নহে, এ কথা না বুঝিয়া অজ্ঞান মানব মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া নিজেরা পশু সাজিতেছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে পরম্পরাক্রমে পশুত্বের সম্ভাবনাই অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে। উন্নতির সোপানাবলি আরোহণ করিতে করিতে সহসা দিশা হারাইয়া বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ দ্রুততরে পদবিক্ষেপে নীচে নামিয়া যাইতেছে, নিশ্চিত মৃত্যু অদূরে বিরাট মুখব্যাদান করিয়া আসন্ন শিকারের আশায় উৎফুল্ল অন্তরে অপেক্ষা করিতেছে। এখন উপায় ব্রহ্মচর্য্য, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য।

ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন আমাদিগকে হতভাগ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, দারিদ্র্য আমাদের মনকে দুর্ব্বল ও দেহকে অস্থি-চর্ম্ম-সার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে, অস্থিপঞ্জর গ্রন্থিভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে—অসংযমে। পুনরায় আমাদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; ছাত্রজীবনে কঠোর নিয়মে

বীর্য্যরক্ষা করিবার জন্য বালক, কিশোর এবং যুবকগণকে ধারাবাহিকভাবে সংযমের পদ্ধতিবদ্ধ কৌশলসমূহ শিক্ষা দিতে হইবে এবং গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য হইতে কাম-পঙ্কিল লোলুপতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া যৌন-সম্মেলনকে দেবভাবের বিভূতি-জালে মণ্ডিত করিতে হইবে।—ইহাই বাঁচিবার পথ।

অর্থসম্পদে দরিদ্র হইয়া দেশ প্রকৃত দরিদ্র হয় নাই; দেশ যে বাঁচিবার ইচ্ছায় দরিদ্র হইয়াছে, তাহাই তাহার চরম দারিদ্র্য, ইহাই তাহার দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। ঝড়ের মুখে মাথা নত করিয়া কোনক্রমে বাঁচিয়া যাওয়ার প্রকৃতি, প্রকৃত বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। - দেশকে বাঁচিবার জন্য ডাকিতে হইবে; জীবন লাভের জন্য, জীবন গঠনের জন্য এবং জীবন দানের জন্য সব দিক দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাই বাঁচিবার পথ।

হে অদূরযুগের ত্যাগিগণ! হে আগামী যুগের আদর্শনিষ্ঠ কর্ম্মিগণ! এই মহাকল্যাণ সাধনকল্পে তোমাদের জন্য আহ্বান আসিয়াছে। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তর-বাহির গৈরিক-রঞ্জিত করিয়া এই শুভ কার্য্যে আত্মদান করিবে। কিন্তু যাহারা সংসারী-জীবনের কর্ত্তব্য-সমূহকে উপেক্ষা করিবে না, আজিকার এ আহ্বান তাহাদেরও জন্য।

দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া আজ ভাগবত জীবনের মহিমা-কীর্ত্তন করিতে হইবে। ভগবানের কাজে দান করিয়াই যে

জীবনের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ হয়, তাহা আজ শত কার্য্যে, শত বাক্যে, শত চিন্তায় প্রমাণিত ও প্রচারিত করিতে হইবে। নগণ্য ক্ষেত্রোপজীবী কৃষাণ হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষপতি ধনীকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, প্রথম জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা, এই দুইটির উপরে জাতীয় কল্যাণের সকল সার্থক প্রয়াসকে ভিত্তিমান্ হইতে হইবে এবং ইহাদের উপরেই জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্যক্ নির্ভর করিতেছে। মূর্খেরও-মূর্খ হইতে আরম্ভ করিয়া মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজগণকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কামজ সন্তান নিজ জীবনে ভগবানকে সার্থকতা দিতে অশক্ত হইয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ কল্যাণকর্ম্মীর সৃষ্টির জন্য আজ প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিতে ব্রহ্মচর্য্য পালন-পূর্ব্বক বৃথা-বীর্য্যক্ষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে হইবে এবং লক্ষ লক্ষ কল্যাণকর্ম্মীর জীবন-গঠনের জন্য আজ সহস্র সহস্র তেজস্বী ও প্রতিভাবান্ যুবককে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া দেহের, মনের ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে,—নিজে আচরণ করিয়া যথার্থ আচার্য্য হইতে হইবে।

নিজেদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দলে দলে তোমরা আজ ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের ব্রত গ্রহণ কর। যে যেমন অধিকারী, সে তেমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রচার কর। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীর্ণ আশ্রম-কুটীরের অভ্যন্তর হইতে এই প্রচারের

ধারা নির্গত হউক, সংসারসেবী গৃহীর গৃহ হইতেও ইহা বহির্গত হউক। সমবেত ভাবে দেশবাসীর সমগ্র শক্তি আজ এই একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থায় প্রযুক্ত হউক,—ভারতের অপচয়োন্মুখ বীর্য্যবিন্দু-সমূহ আজ পরম যত্নে সঞ্চিত হউক, সামর্থ্যের প্রেরণায় ভারতের বজ্রবাহুসমূহ উত্থিত ও উদ্যত-শক্তিও হউক এবং পরবশ্যতার যে অমানিশা ভারতের দেহ, মন ও আত্মাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, পৌরুষ-সূর্য্যের অভ্যুদয়ে সেই অন্ধকার চিরতরে অপগত হউক।

(৩)

দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা আজ দেশোদ্ধারের গোড়ার কথাটুকু বিস্মৃত হইয়া নিজেদের অমিত শক্তি শত প্রকার হুজুগ সৃষ্টি করিতেই প্রায়শঃ ব্যয় করিয়া দিতেছেন। আজ সেই গোড়ার কথাটুকু তোমাদিগকে তলাইয়া বুঝিতে হইবে এবং আত্মগঠন করিয়া অন্যান্য ভ্রাতৃগণের জীবনগঠনে সহায়তা দান করিতে হইবে।

কি সন্ন্যাস-জীবন, কি গার্হস্থ্য-জীবন, উভয়ত্র হইতেই আমরা ভগবানকে ঝাটায় ঝাড়িয়া তাড়াইয়া দিতেছি। আমাদের স্কুল-কলেজে ভগবান্ নাই, এমন কি মঠ, আশ্রম ও দেবমন্দির-গুলিতেও বুঝি সব সময় ভগবান্ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না। সর্ব্বত্র অবিচার অনাচার অবাধে চলিতেছে, সর্ব্বত্র বিধাতার অবমাননা হইতেছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিতে হইবে।

ভগবন্মুখ হইলেই মানুষ অন্তর্মুখ হয়, তাই তাহার বিলাসলিপ্সা ও সম্ভোগ-লালসা অন্তর্হিত হয়। ভগবানকে ভালবাসিতে শিখিলে কামুকের কাম দূর হয়, লম্পটের লাম্পট্য বিশ্বহিতৈষণায় পরিণত হয়। সেই ভগবানকে আজ সকলের জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। মিথ্যার উপাসনা ছাড়িয়া প্রত্যেককে সত্যাশ্রয়ী করিতে হইবে।

কিন্তু ভগবৎ-প্রেম ছাড়া যেমন ব্রহ্মচর্য্যের অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা ব্যতীতও তেমনই ভগবৎ-প্রেম লাভ করা অসম্ভব। অব্রহ্মচারী, অসংযমী, নিত্যবীর্য্যক্ষয়পরায়ণ ব্যক্তি ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে পারে না। চিত্তবৃত্তিসমূহের যতটুকু উন্মেষ হইলে ভগবানে রতি যায়, মনের যতটুকু প্রসার লাভ হইলে পরমসত্য পরব্রহ্মের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে, তাহা ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন ব্যতীত লব্ধ হইবার নহে। তাই আজ তোমাদের প্রত্যেককেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের এবং প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠাদ্বারা তোমরা নিষ্কলঙ্ক হও, নিষ্পাপ হও, যথার্থ ঐশ্বর্য্যশালী হও। আমি যে সমৃদ্ধি তোমাদের মধ্যে দেখিতে চাহি, মদগর্ব্বিত পাশ্চাত্যের কুবের-ভাণ্ডার তাহার অংশের অংশও নহে। তোমাদের যে শুভ্র অকলঙ্ক পবিত্র মূর্ত্তি আজ দেখিতে চাই, তাহার ফটো একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের ব্রমাইড কাগজেই উঠে, অন্য কোন কাগজে উঠে না।

আজ তোমরা নিজেদের কল্পনা-শক্তিকে সহস্রমুখিনী

করিয়া উন্নতির দিকে জাগাইয়া তোল। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বদা নিজেদের অভ্যুত্থিত জাগ্রত জীবনের গৌরব-মণ্ডিত মহিমার ভবিষ্যৎ ছবি দেখিতে দেখিতে পাগল হইয়া যাও। নিজেকে বিশ্বাস কর, আর ভগবানে নির্ভর কর। ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।

যত্ন করিলেও যে তুমি কিছু করিতে পার না, এমন আত্ম-ঘাতী অবিশ্বাসকে যদি তোমার উপর প্রভুত্ব করিতে দাও, তবে জগতের সকল অকুশল তোমাকে ধরিয়া চাপিয়া পিষিয়া মারিবে। সাহস সঞ্চয় কর,—সাহসই কুশলকে আনয়ন করে।

অক্ষত বুদ্ধি ও অটুট বীর্য্যের অধিকারী হইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যের সুকঠোর সাধনা চাই। হে তাপদগ্ধ যুবকের দল! একবার ব্রহ্মচর্য্যের অক্ষয়বটের ছায়াতলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলে, শরীর মন তখনই শীতল হইবে। জানিও, জীবনের পাঠশালায় ইহাই প্রথম অক্ষর-পরিচয়। ক, খ, শিখিতে যে উপেক্ষা করে, ইতিহাসেই হউক আর কাব্যেই হউক, এম-এ পাশ করা তার হইয়া উঠে না। ব্রহ্মচর্য্য পালনে যে অনাদর করে, কর্ম্মেই হউক, আর সাধনেই হউক, বড হওয়া তার ঘটিয়া ওঠে না। আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং সকল কল্যাণের আকর-স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য-মহাব্রত পালনের শুভ-সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে জীবন পণ কর। এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য-জীবন পাইয়া কি লাভ হইল ভাই, যদি না ইহা দেশের কাজে, দশের

কাজে ও জগতের কাজে উৎকৃষ্ট হইবার যোগ্য হইল, যদি না ইহার দ্বারা ইহকালের কল্যাণ লাভ হইল, যদি না ইহা ভগবানকে পাইবার সহায় হইল ?

দেশের নেতারা আজ অনেকেই বালুর দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন, ভগবৎ-প্রীতির বনিয়াদের উপর এবং ব্রহ্মচর্য্যের স্তম্ভের উপর ছাদ রচনা না করিয়া অনেকে বক্তৃতার বনিয়াদের উপর এবং চালাকির স্তম্ভের উপর ছাদ পিটাইতে সুরু করিয়াছেন। ফলে, ভূমিকম্পের অপেক্ষা করিতে হইবে না, একটু জোর বাতাস বহিলেই এসব উড়িয়া যাইবে। তাই আজ তোমাদিগকে সুতীব্র বীর্য্য-সাধনায় আহ্বান করিতেছি।

হইতে পার তোমরা নগণ্য কিন্তু কিছু যায় আসে না। একনিষ্ঠা বিশ্বজয়ী। "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা"। দলে দলে মিলিত হও, অগ্রসর হও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া পদবিক্ষেপ কর। হইলেই বা তোমরা তরুণ বালক, কিন্তু ভাবনা কিসের ? জগতে যত জাতির শিরোমুকুট গৌরবসূর্য্যের কিরণ-প্রভায় দীপ্ত হইয়াছে, তরুণেরাই চিরকাল তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে। বীর্য্যের পতাকা ধারণ করিয়া, পুরোভাগে কস্তূরী-সুরভি তপস্যার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া কল্যাণের অভিযান লইয়া চল ভাই ! একদিন যাঁহারা তুচ্ছ ছিলেন, আত্মদান করিয়াই তাঁহারা চিরবরেণ্য ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্কনিচয়ে মনুষ্যত্বের যে অনপনেয় অনুশাসন রচিত হইয়াছে,

অনর্থমূল সংশয় পরিহার করিয়া তাহার অনুসরণ কর। শত বার শত বাধায় আহত হইয়াও একবার আত্মনিন্দা করিও না বা কর্ম্ম-বৈরাগ্যের আশ্রয় লইও না। জানিও কর্ম্মই ব্রহ্ম।

জগতের কে না ক্ষুধিত ? যে যেরূপ আহার্য্য পাইতেছে, ক্ষুধার তাড়নায় সে তাহাকেই নাকে-মুখে গুঁজিয়া মনকে কলা দেখাইতেছে। দেহের ক্ষুধা-সম্বন্ধেও একথা সত্য বটে, কিন্তু আমি মনের ক্ষুধার কথাই বলিতেছি। এই ক্ষুধিত জগৎকে উপযুক্ত আহার্য্য দিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে আর কুৎসিত, কদর্য্য ও ক্ষতিকর বস্তু গলাধঃকরণে সম্মত হইবে না। কিন্তু কামসেবায় অত্যন্ত দূষিত মনগুলিকে প্রেমের রসাল পরিবেশন করিবার কালে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, প্রেমের আহার্য্যই মানব-মনের শ্রেষ্ঠ আহার্য্য, প্রেমের পানীয়ই প্রকৃত কল্যাণকর ও রুচিকর পানীয়। প্রেমই জীবনের অমৃত, কাম জীবনের কালকূট। এই কথা বুঝাইবার চেষ্টায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা কপটতা থাকিলে চলিবে না। ভগবৎ-সাধনা এবং লোককল্যাণকর কর্ম্মসমূহের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন যতই তুমি প্রেমের স্বরূপ ও রস বুঝিতে থাকিবে, ততই অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তোমাকে মানবের পিপাসাতুর মনের দৃষ্টিকে কামের কূপ হইতে সরাইয়া প্রেমের সাগরের দিকে প্রবহমানা করিতে হইবে। যাহার রুচি নিতান্তই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, যাহার প্রাণাবেগ-সমূহ কামের আস্বাদনে অন্ধ

হইয়া গতিপরিবর্ত্তনে একান্তই অসম্মত হইয়াছে, তাহার রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য খুব শক্ত লোকের প্রয়োজন, চেষ্টারও আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। হাতে সময়, হৃদয়ে উৎসাহ এবং মনে বল থাকে ত' ইহাদের জন্য লাগিয়া যাও। আর যদি অবসরের অভাব হয় কিংবা নিজেকে সম্যক্ সমর্থ বলিয়া মনে না কর, অনায়াসে ইহাদের ভবিতব্য অদৃশ্য-বিধাতার শ্রেষ্ঠতর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হও। কিন্তু সময় ও সুযোগ থাকুক আর না থাকুক, যাহাদের এখনও কোনও রুচিই গঠিত হয় নাই, কামের দুর্গন্ধ এখনও যাহাদের নাসারন্ধ্রে তেমন করিয়া প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহাদের রুচিকে হিতকর ভাবে গঠন করিবার জন্য এবং তাহাদের আত্মসম্ভ্রমকে সর্ব্বপ্রকার সম্ভব-অসম্ভব অকল্যাণের বিরুদ্ধে জাগ্রত ও উদ্যত করিয়া তুলিবার জন্য তোমাকে প্রয়াসী হইতে হইবে। আর আর শতকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হইলেও এই মহাকার্য্যের জন্য তোমাকে সময় করিয়া লইতেই হইবে, শত অনুযোগের মধ্যেও সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়া অকপট শুভেচ্ছায় খাটিতে হইবে। অশেষ যত্ন-সহকারে ইহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, ইহারা বালকই হউক আর যুবকই হউক, ইহাদের শত শত গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, শত শত মহনীয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে, ইহাদের উপরে ইহাদের মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশ, জাতি এবং বিশ্বজগতের অসংখ্য দাবী রহিয়াছে। প্রাণান্ত যত্নে বীর্য্য-ধারণের দ্বারা দেহ ও মনকে সুবলিষ্ঠ গঠন দান করিয়া

অবিরত-প্রয়াস-লব্ধ অসমাপ্ত পৌরুষের শক্তিতে ইহাদিগকে সেই সকল দাবী পূরণ করিতে হইবে। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অপরাজেয় উৎসাহের সহিত দিনের পর দিন ইহাদিগকে এই একই কথা নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে, নানা ভাবে এবং নানা প্রসঙ্গে বলিয়া বলিয়া ইহাদের সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে কর্ম্মাভিমুখিনী করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে যে, আত্মসংযমের বলে ইহারা জগতের সকল অসাধ্য সাধন করিতে পারে, অবিচলিত আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে আজিকার তুচ্ছ মানুষ কাল অসামান্য মহামানবে পরিণত হয় এবং আজ ইহারা যতই হীন ও অবনত থাকুক না কেন, কর্ম্মের প্রভাবে ইহারাই প্রত্যেকে এক একজন আদর্শ-প্রতিষ্ঠাতা জাতি-স্রষ্টায় পরিণত হইবে, নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্তের আকর্ষণে শত শত জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া নিজেরা ধন্য হইবে, কুলকে পবিত্র করিবে, জননীকে কৃতার্থা করিবে। কর্ম্মপ্রেরণার বিস্ফোরক-বিদারণে ইহাদের মনোমধ্য হইতে সকল প্রচ্ছন্ন পাপের আসক্তিকে, সকল অসংযমের লোলুপতাকে ব্যূহভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিতে হইবে। সাময়িক সুখের লোভে সঙ্গোপনে পাপানুষ্ঠানের দ্বারা লোকচক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ সম্ভব হইলেও ভগবানকে যে ফাঁকি দেওয়া যায় না, বীর্য্যক্ষয়রূপ মহাপাপের প্রতিশোধ যে তিনি সুকঠোর হস্তে কড়ায় গন্ডায় আদায় করিয়া ল'ন, এই কথাটী ইহাদের মর্ম্মে গাঁথিয়া দিতে হইবে। হে আমার

চিরনমস্য নূতন যুগের কর্ম্মিগণ! দেশের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে বিকাইয়া দিতে আসিয়া আজ এই কথাটী ভুলিয়া যাইও না। যে পথেই তুমি তোমার সেবাবৃত্তি ও সেবানিষ্ঠার প্রয়োগ করিতে চাহ না কেন, নিশ্চিত জানিও, ব্রহ্মচর্য্যই তোমার দেশসেবার প্রকৃত ভিত্তি। কথায় চিঁড়া ভিজিবে না; যুক্তিতর্ক শুনাইয়া কাহাকেও মানুষ করা যাইবে না। যে ব্রহ্মচর্য্য মানুষ গড়িবার মূলীভূত উপাদান, মানুষ গড়িতে তাহাই চাহি। হয়ত তুমি ভগবানকে বাদ দিয়া দেশসেবা করিতে চাহ না, হয়ত বা তুমি দেশ সেবা করিতে গিয়া ভগবানকে জঞ্জাল মনে করিয়া এড়াইয়া চলিতে চাহ। কাহারও সহিত আমার বিরোধ নাই। কিন্তু ভাই, ব্রহ্মচর্য্য তোমাকেও পালন করিতে এবং প্রচার করিতে হইবে। নতুবা দেখিও তোমার ভগবৎপ্রেম স্বার্থপ্রেমে পরিণত হইবে, তোমার স্বদেশসেবা আত্মসেবায় রূপান্তরিত হইবে। হয়ত বা তুমি নীরবে নিভৃতে আদর্শের সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে চাহ, হয়ত বা তুমি উন্মুক্ত রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবনকে বিস্মরণাতীত এবং মৃত্যুকে মরণাতীত করিতে চাহ। তোমার সহিতও আমার কলহ নাই। যে, যে-ভাবে পার ইহপর-জীবনের চরম কৃতকৃতার্থতা লাভ করিবার জন্য দেহ, মন, প্রাণ ও আত্মাকে বিলাইয়া দাও, কিন্তু ভাই, ব্রহ্মচর্য্য তোমাকেও পালন করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য তোমাকেও প্রচার করিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্যহীনের নীরব কর্ম্ম হতাশায় ঢলিয়া

পড়ে, সরব কর্ম্মের উন্নত আস্ফালন বিপদের মুখে লাঙ্গুল গুটায়। হয়ত তুমি নিঃসঙ্গ-ভাবে একাকী বিবেকের অনুশাসনে চলিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিতে চাহ, হয়ত বা তুমি সমগ্র ভারতব্যাপী সুবিশাল সংঘ গড়িয়া বিবেককে অধিকাংশের (Majority)র হাতে তুলিয়া দিয়া দশের বাণীকেই ভগবানের বাণী বলিয়া মানিয়া চলিতে চাহ। তোমার সহিতও আমার কোনও সংঘর্ষের কারণ নাই। একাই চল, আর মিলিয়াই কাজ কর, বীর্য্যধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার তোমাকেও করিতে হইবে; কারণ বীর্য্যহীন একক কর্ম্মীর মতান্তর ও পথান্তর মুহুর্মুহুঃ ঘটিতে থাকে এবং বীর্য্যহীন সংঘী কখনও সংঘের আদেশ দ্বিধাহীনচিত্তে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না, বরঞ্চ প্রকাশ্যে সংঘের মতে সায় দিয়া অপ্রকাশ্যে ঘরের ইঁদুর হইয়া বেড়ার বাঁধন কাটিতে থাকে। বীর্য্যহীনের প্রেমে পূতিগন্ধ থাকে, বীর্য্যহীনের কর্ম্মে দুর্ব্বলতা থাকে, বীর্য্যহীনের সংঘে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার লোভ থাকে।

(৪)

তোমাদের জন্য ভগবানের চরণে আমার অনেক প্রার্থনা। তোমাদের চরিত্রবলের দ্বারা দেশের বল বাড়ুক, তোমাদের মনুষ্যত্বের দ্বারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের কৌলীন্য-বৃদ্ধি হউক, তোমাদের প্রেম হিংসা-বিদ্বেষকে জয় করুক, তোমাদের জ্ঞান, বিবেক এবং বৈরাগ্য কামক্রোধাদিকে ভস্মীভূত করুক। চিত্তসংযম লাভ করিয়া, বীর্য্যরক্ষা করিয়া, তেজ, বল ও তপঃশক্তি সঞ্চয় করিয়া তোমরা মানুষের মত মানুষ হও, সগৌরবে,

সমুন্নত-মস্তকে, নিঃশঙ্ক-চিত্তে ধরাবক্ষে বিচরণ কর,—নিজেরা সর্ব্বপ্রকারে আদর্শস্থানীয় পুরুষ হইয়া শত শত ভয়-ভীতকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত কর, শত শত পথভ্রান্তকে প্রকৃত কল্যাণের পন্থা প্রদর্শন কর। তোমাদের দ্বারা বিশ্বমানব লাভবান হউক, তোমাদের ওজস্বিতা ও নির্ভীকতা ভারতের জাতীয়-জীবন-গঙ্গায় নবতরঙ্গের সৃষ্টি করুক। জগৎ আজ সর্ব্ববরেণ্য মহা-পুরুষদিগের চরণস্পর্শ চাহিতেছে। তোমাদের প্রত্যেকের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইবার জন্য ভবিষ্যৎযুগের অনন্ত-কোটি অনাগত মানব-সন্তান আজ মাতৃজঠরে অপেক্ষা করিতেছে। তোমরা আজ পূর্ব্বাচার্য্য এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হও।

(৫)

কামাতুরতা নিত্য যাহাদের বুকের মাংস চিবাইয়া খাইতেছে, সম্ভোগলিপ্সা যাহাদের পঞ্জরাস্থির ভিতরে বাঁশের ঘুণের মত প্রবেশ করিয়াছে, স্বদেশ-সাধনায় এবং জগৎকল্যাণে তাহাদেরও অধিকার আছে। দেশের এবং জগতের সেবা করিতে যাইয়াই তাহারা ক্রমে ক্রমে নিত্যবুদ্ধ শুদ্ধ-স্বভাব হইবে, দেশকে এবং জগৎকে ভালবাসিয়াই তাহারা ধীরে ধীরে কামমোহের ঊর্ণনাভতন্তু ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে। শ্রীভগবানের কৃপা যে সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত, তাহার প্রেম-প্রবাহ যে সকলের মনের জমির ধার বাহিয়াই চলিয়াছে, ত্যাগ-স্বীকার করিতে শিখিয়াই মানুষ তাহা বুঝিবে। আজ কাহাকেও উপেক্ষা

করিবার অধিকার কাহারও নাই। পাপী, তাপী, অক্ষম, অসমর্থ প্রভৃতি প্রত্যেককেই ডাকিয়া আনিয়া আত্ম-বিশ্বাসের মূলধন বিলাইতে হইবে এবং জগৎকল্যাণকল্পে এই মূলধনের সম্যক্ সদ্ব্যবহারের দ্বারাই যে সে নিজে মানুষ হইবে এবং অপরকে মানুষ করিয়া তুলিবে, সে কথা অবিস্মরণীয় করিয়া বুঝাইতে হইবে। কামুক! তুমি আজ পিছাইয়া থাকিও না, জগৎকল্যাণেই তোমার কামজয় হইবে। লম্পট! আত্মঅবিশ্বাস করিও না, সকলের সেবার মধ্য দিয়াই তোমার লাম্পট্যের অবসান ঘটিবে এবং তোমার কল্যাণচেষ্টার সহিত যদি ভগবানের ত্রিকুলবিজয়ী নামের প্রাণে-মনে সংযোগ থাকে, নিশ্চিত জানিও, তোমার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী, তোমার অভ্যুত্থান চিরনির্দ্ধারিত।

(৬)

আত্মজীবনে কল্যাণ-লাভকেই যথেষ্ট মনে করিতে পার না। নিজে কল্যাণবন্ত হইয়া অপরাপর প্রত্যেকের অন্তরে কল্যাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতে না পারিলে মনুষ্যজীবনের সুবিপুল সার্থকতা যেন হীনাঙ্গ ও ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পড়ে। পরকে দিয়াই মানুষের ব্যক্তিত্বের গৌরব। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই মহাবাণীকে জীবন-মুকুরে প্রতিবিম্বিত না করিতে পারিলে মনুষ্যদেহধারী হইয়াও চিরকাল আমরা অমানুষই রহিব। জীবন সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হইয়া যিনি মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসে অগ্রসর হন, তিনি বীর বটে,

কিন্তু যিনি নিজে অগ্রসর হইবার সাথে সাথে ভৈরব-হুঙ্কারে আবাহন করিয়া আরও দশ জনকে মরণ-ভয়-রহিত করেন, তাঁহাকে আমি মহাবীর বলিব। যিনি জাগিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ; যিনি নিজে জাগিয়া শত শত ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেছেন, তিনি দেবতা। কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণা পাইয়া যিনি নবজাগ্রত জীবনে যৌবনের মলয়-হিল্লোল পাইয়াছেন, তিনি ভাগ্যবান্; কিন্তু যিনি শত শত রুগ্নমনা, জীর্ণোৎসাহ, ভগ্নবিশ্বাস, হতোদ্যম হতভাগ্যদের মধ্যে কর্ম্মে-ষণার প্রচণ্ড বিপ্লব-তাড়নার সৃষ্টি করিয়া পঙ্গুকে দিয়া গিরি-লঙ্ঘন করাইবেন, তেমন ব্যক্তি মহাভাগ্যবান্। আমি এই সকল কর্ম্মপ্রেরক মহামানবগণকে তোমাদের মধ্য হইতেই পাইতে চাহি। তাই, অকুণ্ঠিতচিত্তে তোমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

(৭)

আরও একটী কথা না বলিয়া রাখিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তোমার ভিতরে বা তোমার বালক ও যুবক বন্ধুদের ভিতরে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠাই সব নহে, তোমার ভগিনীটীর ভিতরেও ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বহু মহাপুরুষ নারীজাতির নিন্দা করিয়াছেন। কেমন নারীর নিন্দা করিয়াছেন, জানো কি? যে নারী নিজ জীবন গঠন করে নাই বলিয়াই পুরুষের প্রলোভন-বর্দ্ধনী, আত্মসংযম অভ্যাস করে নাই বলিয়াই প্রিয়জনেরও

অমঙ্গল-কারিণী, মনুষ্যজন্মের দায়িত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই পুরুষের অন্তরে লালসা-হলাহল-সঞ্চারিণী,—সেই নারীর। তোমার ভগিনীটীকে তুমি এই শ্রেণীর নারী হইতে পৃথক্ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিও। দৃষ্টিতে তাহার তপস্যার অগ্নি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ুক, কণ্ঠে তাহার তপস্যার মধুরতা দিগ্দেশ আচ্ছন্ন করুক, সান্নিধ্যে তার অপবিত্রতার উচ্ছ্বসিত সাগর-তরঙ্গ স্তব্ধ হউক। এমন শিক্ষা তুমি তোমার ভগিনীটিকে দাও, যেন, তাহার দৃষ্টির পবিত্রতা ত্রিভুবনকে স্নিগ্ধ করে, পাপতাপহীন করে, জান্তব-তাণ্ডব হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দেবত্বের সাত্ত্বিকতায় বিমণ্ডিত করে। তাহার মুখের বাক্য যেন জননীর স্নেহ দিয়া পশুর পশুত্বকে ঘুম পাড়ায়, তাহার বুকের নিঃশ্বাস যেন শত যোজন দূরে তাহার অলঙ্ঘনীয় মহিমাকে নিয়া বিস্তারিত করিয়া দেয়। যে তাহাকে দেখিয়াছে, সে যেন পাপ ভোলে ; যে তাহার কাছে আসিয়াছে, সে যেন নবজন্ম পায় ; যে তাহার চিন্তাটুকুও করিয়াছে, সে যেন জীবনের সহস্র ব্যর্থতায় পদাঘাত করিয়া নূতন করিয়া জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহস পায়, প্রেরণা পায়। এই শিক্ষা তুমি তোমার ভগিনীকে দাও। তবেই ভারত পুনরায় সোণার ভারতে পরিণত হইবে। তোমার অধঃপাতে তোমার জাতির অধঃপাত, কিন্তু নারীর অধঃপাতে সমগ্র জগতের অধঃপাত।

—ঃ * ঃ—

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১)

ভগবানকে কর তুমি তোমার জীবনের কেন্দ্র। তোমার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যৌবন আসিয়া ডাক ছাড়িতেছে,—"আমি আসিয়াছি"। তুমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ডাক ছাড়িয়া বলিতে সমর্থ হও,—"আমার দেহ-মন্দিরে ভগবানও আসিতেছেন।" যৌবনকে তুমি সম্বর্ধনা কর, তোমার জীবনের বসন্তকে তুমি ব্যর্থ যাইতে কেন দিবে? যৌবন কেবল দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পিক-কুস-কুজনই জাগাইতে আসে নাই, তোমাকে ভগবানের প্রেমে মজাইতে এবং মাতাইতেও আসিয়াছে। তোমাকে দেখিয়া নিখিল বিশ্বের কত যুবক ভগবানের প্রেমে মাতিবে,—তোমার যৌবন তাহারও জন্য আসিয়াছে। যৌবনকে অবহেলা করিও না, তাহাকে আদর করিয়া বরণ কর। যৌবনকে বৃথা অপচয়িত হইতে দিও না, তাহাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজে, মহত্তম তপস্যায় নিয়োজিত করিয়া সার্থক কর। আসিল এবং চলিয়া গেল, তোমার যৌবন যেন এমন না হয়। আসুক সে তোমার সুদূর বার্দ্ধক্যের তুষারশুভ্র সৌন্দর্য্যেও তোমার নিত্যসাথী হইয়া থাকিবার জন্য। যে আসিয়াছে, তাহাকে থাকিতে দাও তোমার জীবন-ব্যাপী সাফল্যের ও গৌরবের সাক্ষী হইয়া।

(২)

শরীরের প্রতি অণু-পরমাণু হইতে যেন নবশক্তির নির্ঝর বহিতেছে,—ইহাই ত' যৌবন। প্রতিটি ইন্দ্রিয় জগতের বিষয়াবলীকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতেছে। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নূতন জাগরণ, নূতন শিহরণ তুমি অনুভব করিতেছ। এই সময়ে লক্ষ্য রাখিও, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যেন তোমার সঙ্গছাড়া না হয়। অভ্যাস, রীতিনীতি, আশা, বিশ্বাস, কর্ম্মভঙ্গী, রুচি—সবই ত' এখন তোমার অনুকরণীয় হওয়া উচিত। তুমি আজ যাহা, সুদূর ভবিষ্যতেও তোমাকে তাহাই থাকিতে হইবে, এই পণ লইয়া তুমি আত্মগঠন করিতে লাগিয়া যাও। যৌবনে যে বেহিসাবী, বার্দ্ধক্যে তাহার দুঃখ রুধিবে কে? আজ যখনি যাহা ভাল-মন্দ করিতেছ, সুদ শুদ্ধ তাহা যে তোমাকে পঁচিশ বৎসর পরে গণিতে হইবে। হিতকথা আজ কাণ দিয়া শোন, হিতবুদ্ধি আজ মন দিয়া গ্রহণ কর, হিতপথে আজ সর্ব্বশক্তি লইয়া চল। যৌবনের নবজাগ্রত উদ্বেল তরঙ্গ যেন তোমার চরিত্রের সৌধ না ভাঙ্গিতে পারে। ইহাই ত' সময়, যখন তোমাকে চপলতার কবল হইতে সযত্নে সতর্ক দৃষ্টিতে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। যৌবনে অসংযমী হইয়া জীবনকে চিরকালের জন্য দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি, অসাফল্য ও দুর্ব্বলতার কাছে বন্ধক রাখিও না। তোমার জীবনকে তুমি সর্ব্বশক্তি দিয়া সর্ব্বপ্রকার কলুষ হইতে

রক্ষা করিয়া চল, কারণ, তাহা হইলেই জীবন সুদীর্ঘকাল উপভোগ্য থাকিবে। ক্ষণিকের ভোগ-সুখের ইন্ধন জ্বালাইয়া জীবনের সুচিরস্থায়ী ভোগ-সামর্থ্য ও অনন্ত ভোগের সুযোগকে চিতাভস্মে উড়াইয়া দিও না। এমন সদভ্যাস-সমূহ আজ আয়ত্ত কর, যাহা পরিপক্ব বার্দ্ধক্যে হইবে তোমার জীবনের পরম সহায় ও একান্ত রক্ষক।

(৩)

যৌবনের অরুণ-উদয়ে
ক্লান্তিহীন ইন্দ্রিয় তোমার
ক্ষণসুখ-ভোগ-নিমন্ত্রণে
তোমারে ডাকিছে বারংবার।
কহিতেছে, "এমন সুদিন
ভবিষ্যতে পাইবে কি আর?
ফুলময়ী সারা তনু তব
চতুর্দ্দিকে শোভার বাহার?
প্রতি অণু-পরমাণু মাঝে
মধুময় সুখ-শিহরণ
ফুল-মালা গলে দোলাইয়া
তোমারে যে করিছে বরণ!"
তোমার অন্তর-মাঝে শোন
প্রাণের দেবতা ডাকি' কহে—

যৌবনের নব-জাগরণ
ক্ষণিকের সুখ তরে নহে।
অনন্ত সুখের বার্ত্তা শুধু
সান্ত এই ইন্দ্রিয়-নিচয়
তাহাদের সান্ত ভাষা দিয়া
অসম্পূর্ণ ভঙ্গিমায় কয়।
যে সুখ এখনি করি' ভোগ
আপনারে করিবে উজাড়,
প্রলোভন তার দমাইয়া
পাবে সুখ অনন্ত অপার।
সমগ্র জীবন জুড়ি' সুখ
পাইবারে যদি তুমি চাও,
ক্ষণ-কাল বিলম্ব না করি'
এখনি সংযম-ব্রত নাও।"

(৪)

তোমার সর্ব্ব অঙ্গে জাগরণ আসিয়াছে। এমন সময়ে মনকে কি ঘুমন্ত থাকিতে দিবে? দেহের জাগরণ তোমার চক্ষে বক্ষে, চর্ম্মে, কর্ম্মে নানা উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেছে। এই সময়ে মনকেও কি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে না? শরীরের প্রতি অঙ্গে নিত্য-নূতন ক্ষুধা জাগিয়া উঠিতেছে, সেই ক্ষুধা তোমার

মনে কত স্বপ্নের কুহেলী সৃষ্টি করিতেছে। মনকে কি সেই কুহেলিকার আবেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া সরল মেরুদণ্ডে দাঁড়াইতে দিবে না? তাহাকে কি ডাকিয়া বলিবে না,—"তুমি জাগো, তুমি তোমার সর্ব্বশক্তি দিয়া আমার জন্য কল্যাণের ভিত্তি রচনা কর। যৌবন আমাকে সুখতৃষ্ণা দিয়াছে, তুমি আমাকে সুখের স্থায়িত্ব প্রদান কর।"

(৫)

যৌবন কর্ম্মশক্তিকে বর্দ্ধিত করে, যুক্তিকে ঘোলাটে করে। তাহার যৌবনই দীর্ঘস্থায়ী, যে তাহার সামর্থ্যকে সদ্‌বুদ্ধির, স্বচ্ছ বুদ্ধির, শুদ্ধ বুদ্ধির অধীন রাখে। যৌবন স্বপ্নেরই আগার। তুমি তোমার কুস্বপ্নগুলিকে দূর করিয়া দাও। স্বচ্ছ সুন্দর, সর্ব্বজীবহিতকর স্বপ্নকে সমাদর কর। চিন্তাকে তোমার অধীন কর, তুমি তোমার কুচিন্তার অধীন হইও না। তোমার সচ্চিন্তাকে তুমি প্রকাশ্য কর্ম্মে রূপ দাও, তোমার অসচ্চিন্তাকে তুমি সকল প্রচ্ছন্ন আচরণ হইতেও দূর করিয়া দাও।

(৬)

জীবনের প্রত্যেকটী অধ্যায়েই প্রলোভন আসে। যুবকের নিকটে যৌবনোচিত প্রলোভন, বৃদ্ধের নিকটে বৃদ্ধজনোচিত প্রলোভন আসিয়া থাকে। এমন জীবন নাই, যে জীবনে প্রলোভন নাই, পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই! কিন্তু যৌবনে যে

প্রলোভনে টলে নাই, বার্দ্ধক্যের প্রলোভন তাহাকে কমই কাবু করিতে পারে। যৌবনে যে বিজয়ী হইয়াছে, বার্দ্ধক্যে তাহার বিজয় রুধিবে কে? তোমার প্রলোভন-বিজয় তোমার মধ্যে বিজয়ীর স্বভাব সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জয়কে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিও না, তাহারা তোমার মধ্যে জয়িষ্ণুতাকে স্থাপিত করিতেছে। ফলে, পরবর্ত্তী বিজয়-সমূহ তোমার বিনা ক্লেশে হইবে, কটাক্ষে ঘটিবে। প্রত্যাসন্ন ক্ষুদ্র প্রলোভনকে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রশ্রয় দিও না। ঘরের চালায় ক্ষুদ্র একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িলে সে কি সমগ্র পল্লীকে জ্বালিয়া ছাই করিয়া দেয় না?

(৭)

যৌবনে যে সুযোগ নষ্ট করিবে, প্রৌঢ়ে আর বার্দ্ধক্যে সেই সুযোগ শত মাথা খুঁড়িয়াও ফিরিয়া পাইবে না। যাহা জীবনে লাভ করিতে চাহ, তাহার জন্য শ্রম ত' এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যাহা তুমি হইতে চাহ, তাহার সাধনা ত' এখনই ধরিতে হইবে। যৌবনের আকাশে ফানুস উড়াইবে আর বার্দ্ধক্যে প্রাসাদে বাস করিবে, ইহা অলস কল্পনা। বার্দ্ধক্যের প্রাসাদ যৌবনেই ভিত্তির গাথুনি দাবী করিতেছে। বার্দ্ধক্যে যে কোটি কোটি নরমুণ্ডের উর্দ্ধে নিজের শির উচাইয়া দাঁড়াইতে চায়, যৌবনে তাহাকে মস্তক নত করিয়া গাইত-কোদাল-শাবল ধরিয়া ভিত্তির মৃত্তিকা খনন করিতে

হইবে। লোহা লাল টক্‌টকে থাকিতেই তাহাতে হাতুড়ির আঘাত করিতে হয়, তবে না তাহা অভীপ্সিত গঠন নেয়। যৌবনে তোমার দেহমন নূতন রক্তকণিকায় লাল হইয়া আছে। আঘাত করিয়া করিয়া ইহাকে এখনই ঈপ্সিত মূর্ত্তিদান করিতে হইবে। বার্দ্ধক্যে যখন হাতুড়ি মারিবে, তখন লোহা ভাঙ্গিবে কিন্তু মুড়িবে না।

(৮)

যৌবনকে ক্ষণস্থায়ী জানিয়াই সকলে ইহার সুখ-ভোগে অন্ধের মত ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং 'মরিয়া' হইয়া যৌবনের সুখ-লুন্ঠনে লাগিয়া যায়। কিন্তু যৌবনের সদ্ব্যবহার যে করিয়াছে, তাহার যৌবন অচিরস্থায়ী হয় না। যৌবনে পাপ ও প্রলোভন হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া যে চলিয়াছে, তাহার যৌবন অচিরস্থায়ী হয় না। সত্যই যৌবন ক্ষণস্থায়ী নহে। এখন যাহা তোমার দেহে মনে শত চঞ্চলতা জাগাইতেছে, তাহাকেই সংযমের গন্ডীর মধ্যে রাখিয়া কলুষ ও কলঙ্কের ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা করিয়া যদি মাত্র ছয়টী বৎসরও ধীর ও সুনিশ্চিত পদবিক্ষেপে জীবনের পথ চলিতে পার, দেখিও, তোমার যৌবন তোমাকে তোমার শুভ্রকেশ বার্দ্ধক্যেও পরিত্যাগ করে নাই, সেদিনও যৌবন তাহার দুর্জ্জয় সাহস লইয়া, অমিত পরাক্রম লইয়া, অতুল দৃঢ়তা লইয়া তোমার দেহে, তোমার বাক্যে, তোমার চিন্তায়, তোমার কল্পনায়, তোমার শারীরিক ও

মানসিক সদভ্যাসে, তোমার অতুলনীয় উদারতায় নিশ্চিন্তে বিরাজ করিতেছে। ভবিষ্যতের সেই পুঞ্জায়মান সম্পদ, তোমার সেই সুতৃপ্ত মনস্বিতা তোমাকে কোটি নর-নারীর মধ্যে উন্নতশির ও শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিবে। ভারতের আদর্শ বর্ষীয়ান্ ঋষি, যাঁহার চরণে সাম্রাজ্যেশ্বরও চিরপ্রণত। মনে রাখিও, সেই ঋষি তরুণ তাপসেরই স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণ পরিণতি।

(৯)

যৌবনের নব উন্মাদনায় তোমাদের মত তরুণেরা ভুলিয়া যায় যে, কেবল ভাব-প্রবণতাই জীবনের লক্ষণ নহে, জীবনকে সফল করিতে হইলে সকল ভাবালুতাকে যুক্তি, বিচার এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সংযত করিয়া চলিতে হইবে। ভাবালুতা আকাশের অবলম্বনহীন ছিন্ন ছিন্ন মেঘ। যুক্তি সকল বিচ্ছিন্ন মেঘকে একত্র করিবার বৈদ্যুতিক আকর্ষণ। মানুষের অভিজ্ঞতা সেই মেঘসমূহকে বায়ুর চাপে বর্ষণোদ্যত করিয়া ধরণীকে শ্যামল সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ করিবার সুব্যবস্থা। তোমার আগেও যাঁহারা যুবক ছিলেন, তাঁহারা কি করিয়া ঠকিয়াছেন, কি করিয়া জিতিয়াছেন, তাহার খোঁজ লইতে ভুলিও না। জীবনের সকল রঙ্গীণ স্বপ্নই সত্য হয় না, কিন্তু জীবনের সত্যকে স্বপ্নের অপেক্ষাও রঙ্গীন করিয়া উপভোগ করা যায়। যে যৌবনকে অপব্যবহার করে নাই, এমন লোভনীয় অধিকার একমাত্র তাহার।

(১০)

তুমি কেবল একটা ব্যক্তি নহ, সমগ্র জাতির পক্ষে তুমি একটা শক্তি, সমগ্র জগতের পক্ষে তুমি একটা ভরসা, একটা আশ্বাস। নিজেকে নরক-কুণ্ডে ডুবাইয়া দিলে কেবল তোমারই ক্ষতি হয় না, জাতির হয় শক্তিক্ষয়, জগৎ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তুমি কেবল তোমাকে লইয়াই নহ,—দেশকে লইয়া, জাতিকে লইয়া, সমাজকে লইয়া, জগৎকে লইয়া তুমি। তোমার অভ্যুদয় ইহাদের সকলের অভ্যুদয়, তোমার অধঃপাত ইহাদের সকলের অধঃপাত। মনে রাখিও, তোমার ভিতরে ভাবী কালের একটা বিরাট জাতি ঘুমাইয়া আছে। তোমার জীবন যদি না জাগে, ইহাদের এই নিদ্রা আর ভাঙ্গিবে না। তুমি যদি জাগিয়া উঠিয়া হুহুঙ্কারে মেদিনী বিচরণ করিতে আরম্ভ কর, ইহারা একে একে জাগৃতির জগতে নামিয়া আসিবে, জগতের অসীম হিত সাধনের জন্য কত ভাঙ্গাগড়ার খেলা খেলিবে, কত নূতন সৃষ্টির মহিমায় জগতের ইতিহাসকে মণ্ডিত করিবে। তোমার ভিতরে একটা নবজাতি, একটা নবজগৎ, একটা নবযুগ আত্মোন্মেষের জন্য প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। ইহা ভুলিও না।

(১১)

যে চিন্তা অপরের অসাধ্য, যুবকেরা তাহা করিতে সমর্থ। এখানেই যৌবনের জয়। চিন্তায় যে জয়িষ্ণু, কর্ম্মেই বা সে

ক্ষয়িষ্ণু হইবে কেন ? এখানেই যৌবনের সম্মান। যেখানে অপরে হয় কুণ্ঠিত, যুবক সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়ে ; এখানেই যৌবনের সার্থকতা। যুবক তুমি, মহান্ গৌরবের তুমি আস্পদ। তোমার নিকটে প্রত্যাশা আমার কত, তাহা কি ভাবিয়াছ ? সমগ্র দেশ প্রত্যাশী নয়নে তোমার পানে তাকাইয়া আছে। তোমার পিতার, তোমার মাতার কি প্রত্যাশা তোমার নিকটে, তাহা হয়ত তুমি বুঝিতে পার নাই। সংসারের সহস্র দুঃখের উৎপীড়নে তোমার নিকটে হয়ত ইহজীবনে দু-মুঠা অন্ন আর পরজীবনে পিণ্ড ছাড়া কিছুই তাঁহারা চাহেন না বা চাহিতে ভরসা পান না। কিন্তু নিখিল ভুবনের প্রতিটী প্রাণী মুক্তিকামনায় তোমার সেবা চাহিতেছে। তুমি কি এত বড় প্রত্যাশার মুখে নিজের জীবনকে এমন কোনও কুকার্য্য দ্বারা কলুষিত করিবে, যাহা তোমার জীবনের সুমহতী সম্ভাবনাগুলিকে মাটি করিয়া দেয় ?

(১২)

একটা দেশ বা জাতির শক্তিমত্তা কাহাদের উপরে অধিক নির্ভর করে ? একটা জাতির উন্নতিমুখিনী গতি-বেগ কাহাদের মুখপানে তাকাইয়া চলে ? একটা জাতির বিপত্তি-কালে কাহাদের আত্মবলিদান সর্ব্বাধিক প্রয়োজন হয় ? তাহারা কি তোমাদের মত যুবকেরা নহে ? কিন্তু কোনও কারণে তোমাদের যদি শক্তি কমিয়া যায়, তবে দেশ বা জাতি কাহার ভরসা

করিবে? তোমাদের দুর্ব্বার গতি যদি আত্মসুখের হীন কামনার পঙ্কে পড়িয়া থামিয়া যায়, তবে দেশ বা জাতি কাহার প্রত্যাশায় থাকিবে? তুচ্ছ সুখের প্রলোভনে পড়িয়া যদি তোমরা নীচ কার্য্যের অনুশীলনে নিজেদের জীবনের মূল্য কমাইয়া দাও তাহা, হইলে তোমাদের আত্মবলিদানের রুচি, সাহস ও সার্থকতা কোথা হইতে আসিবে? ক্ষণিককে ছাড়িয়া স্থায়ী সুখের দিকে লক্ষ্য দাও, তরলকে ছাড়িয়া প্রগাঢ় সুখের জন্য আগ্রহবান্ হও, বৃহত্তম সুখকে আয়ত্ত করিবার জন্য সীমিত তোমার ইন্দ্রিয়-নিচয়কে অসীম শক্তির অনুশীলনের দিকে ধাবিত কর। সেই পথই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার পথ, তোমার দেশবাসীর ও জগদ্বাসীর প্রত্যাশা-পূরণের পথ।

(১৩)

প্রভাত আছে, সায়াহ্ন নাই, এমন দিন কি কখনও দেখিয়াছ? উদয় আছে অস্ত নাই, এমন সূর্য্য কি কোথাও দেখিয়াছ? প্রতিটি দিবসেরই দিনান্ত আছে। যৌবনও তোমার চিরকাল থাকিবে না। এখন মনে করিতেছ, চিরকাল এভাবে চলিবে কিন্তু পৃথিবীতে কাহারও যৌবন চিরস্থায়ী হয় নাই,—তোমার পিতার না, তোমার পিতামহের না, তোমার প্রপিতামহের না। সকলেরই যৌবন যথাকালে চলিয়া গিয়াছে। তোমারও যাইবে। কিন্তু না চলিয়া যাইতেই তাহার প্রকৃষ্টতম সদ্ব্যবহার করিয়া লও। যৌবনকে কাজে লাগাও।

তোমার ভাবী জীবনের জন্য সুনিশ্চিত সম্পদ, অটুট শৌর্য্য, অতুল শান্তি সংগ্রহের কাজে যৌবনকে প্রয়োগ কর, তাহাকে তুচ্ছ ব্যাপারে অপচয়িত করিয়া দিও না। এখন যাহা বুনিবে, ভাবী কালে তাহারই ত' ফসল তুলিবে! কাঁটার কৃষি করা হইতে বিরত হও, পারিজাতের চাষ কর। দুখের বন সৃষ্টি না করিয়া সুখের অমর রচনা কর। অনুতাপ আর মর্ম্মদাহ কুড়াইবার জন্য বীজ ছড়াইও না, তৃপ্তি আর আত্মপ্রসাদ চয়নের আয়োজন কর। ধৈর্য্য আর আত্মবিশ্বাস লইয়া চলিলে কোন্ অসাধ্যকে না তুমি সাধিতে পার?

জগতের অধিকাংশ মানব জীবনের প্রথমাংশকে এমন কার্য্যে নিয়োজিত করে, যাহার ফলে তাহাদের জীবনের শেষের অংশ হয় নানা দুঃখে কণ্টকিত। ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি রাখিয়া চল, অনেক সন্তাপের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

(১৪)

জীবনের ধ্যানকে সুস্থির করিয়া লও। এমন হউক তাহা সুন্দর, যাহাকে জগতের একটী প্রাণীও অসুন্দর বলিতে সাহস না পায়। এমন হউক তাহা উজ্জ্বল, যাহাকে জগতের সকল মেঘমালায়ও ঢাকিয়া রাখিতে না পারে। এমন হউক তাহা জীবনদায়ক, যেন তাহা তোমাকে তোমার পরিপক্ব বার্দ্ধক্যেও পরিহার না করে। যৌবনের স্বপ্নকে দুর্ব্বল থাকিতে দিও না, সে যেন অমর পরমায়ু আর অতুলন শক্তি লইয়া তোমার অভিবাদন গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৫)

যৌবনে যারা নিজেরে করিল নিঃস্ব
প্রৌঢ়ে তাদের দেখিয়া নিখিল বিশ্ব
কহিবে,—"দেখরে কোটিপতি আজ ভিখারী,
যৌবনে তার ছিল না পথের দিশারী।
কেহ কহে নাই,—'অপচয়, করি' রুদ্ধ
পৌরুষ-বলে হওরে আজি প্রবুদ্ধ ;
করি' বল-লাভ, ত্রিভুবনে যা অতুল্য,
নিজের জীবন কর রে অমিত-মূল্য।'
তাই বুঝি হায় ক্ষয়িত-পরম পুণ্য
এ মহাজনের ভাণ্ডার চির-শূন্য।"

(১৬)

মলয়-মারুত বহে, বসন্তের সুষমা উজ্জ্বল,
বিচিত্র মধুর হাসি, আঁখি তার প্রেমে ঢল ঢল।
ফুটিল যৌবন-ফুল, বৃন্তে ভ্রমর-গুঞ্জন,
উদ্‌ভ্রান্ত কোকিলা ভৃঙ্গী,—সর্ব্ব অঙ্গে জাগে শিহরণ।
বসন্তে ফুটিল ফুল, শরতে হইবে ইহা ফল,
ধৈর্য্য ধরি' প্রতীক্ষার প্রয়োজন রহিল কেবল !
কিন্তু হায় কীটকুলে কোরক কাটিয়া করে শেষ,
ঝরিল যৌবন-ফুল প্রাণনের না রহিল লেশ ;
অন্ধ খঞ্জ আতুর সে কাটাইবে পঙ্গুর জীবন,
বসন্ত হইল মিথ্যা, ব্যর্থ হ'ল মলয়-পবন।

ভগবানকে ভালবাসিলে মনের চঞ্চলতা দূর হইয়া যায়। কেন যায়? চঞ্চলতা অসম্পূর্ণতারই ফল। যেখানে পূর্ণতা রহিয়াছে, চঞ্চলতার সেখানে মাথা তুলিবার সাধ্য কি? ভগবান্ পূর্ণতা-স্বরূপ। পূর্ণতা-স্বরূপ বলিয়াই তিনি পবিত্রতা-স্বরূপ। তাঁহার চিন্তনে মনের দর্পণে পূর্ণতার প্রতিবিম্ব পড়ে, পবিত্রতা ছায়া-বিস্তার করিয়া মনকে প্রেমরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। তাই পাপ, কাম, চপলতা দূরে সরিয়া যায়। ভগবানের চিন্তা বিশ্বসুখের উদ্দীপনা জাগায়, আত্মসুখকে ক্ষীণ ও ম্রিয়মাণ করে। তাই, জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে ভগবানকে স্মরণ করিও, হৃদয়ের সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার পূজা না করিয়া কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করিও না।

(১৮)

তোমার জীবনের অর্ঘ্য ভগবানের পায়ে অর্পণ কর। ইহা তোমার জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। তার পরে ইহা নির্ম্মাল্য হইয়া জগতের প্রতিজনের সংস্পর্শে আসুক। অকপটে যে জীবন ভগবানে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সে জীবনের সংস্পর্শে যে যখন আসুক, নির্ম্মাল্যের পবিত্রতাকে সম্মান করিয়া চলিতে সে বাধ্য হইবে। চর্ম্মচক্ষে মানুষ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না সত্য কিন্তু পবিত্রতা-রূপে যে প্রভা তিনি বিকিরণ করিতেছেন, তাহা অনুভব করিতে পারে এবং তাহার সৌরভ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। যে যতটুকু পবিত্র, সে

ততটুকু ভগবানের, সে ততটুকু উন্নত, সে ততটুকু আদরণীয়। ভগবানের হও,—পবিত্রতার দিব্য সুগন্ধ তোমার সমস্ত অস্তিত্বকে বেড়িয়া ধরিবে।

(১৯)

ভগবানকে ভালবাসিলে কাম আপনি কমিয়া যায়, ক্রোধ আপনি থামিয়া যায়, লোভ আপনি দমিত হয়,—ইহার জন্য আলাদা করিয়া আর কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মানবের সকল আচরণে, সকল দৃষ্টিভঙ্গীতে, সকল চিন্তা-ধারায় কামের অপ্রতিহত মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন এবং অর্দ্ধোপভুক্ত ও অনুপভুক্ত কামের কুফল কেমন করিয়া সমাজের প্রতি অঙ্গে অকল্পনীয় অশান্তি আনিয়াছে, তাহা দেখিয়া কামকে অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত উপভোগ করিয়া মনের বিকার প্রশমিত করিয়া লইয়া সকলকে শান্তি ও নিরুদ্বেগ জীবনের পথপ্রদর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের ঋষি কামের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। নিখিল ভুবন প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাই সব-কিছু এখানে প্রেমময়। সেই প্রেম ক্ষুদ্র আধারে পতিত হইয়া কাম নাম ধারণ করে। আবার অনন্ত অসীম পরমেশ্বরে পতিত হইয়া নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে, প্রেম হয়। কাম প্রেমেরই বিকার মাত্র, প্রেমই নিত্যশুদ্ধ অবস্থা। আত্মসুখের লিপ্সার সহিত যখন মিশ্রিত হয়, প্রেম

তখন কাম হইয়া যায়; বিশ্বসুখের, বিশ্বাত্মার সুখের, বিশ্বপ্রভুর সুখের লিপ্সার সহিত যখন যুক্ত হয়, কাম তখন প্রেমে পরিণত হয়। পরমেশ্বরই কামের রূপ ধরিয়া সর্ব্ব-প্রাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যেই মুহূর্ত্তে কোনও প্রাণী জানিল যে, কামের পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব নাই, ঈশ্বরের প্রেমময় অস্তিত্বেই তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব, তখন আর কাম তাহার ক্ষুদ্র লক্ষ্য, ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ক্ষুদ্র লীলা-বিলাস-লাস্য লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তখন সে প্রেমের বিশ্বম্ভরী মূর্ত্তি ধারণ করে এবং একজনের প্রতি অর্পিত তুচ্ছ ভালবাসাকে বিশ্বের প্রতি জনের প্রতি বিসর্পিত করিয়া দিয়া নিজেও হয় প্রতিক্রিয়াবর্জ্জিত মধুময়, বিশ্বকেও করে বিপুল আনন্দে উল্লসিত। ভগবানকে ভালবাস, অন্তরের কামকে ভগবানের কোলে ফেলিয়া দাও, তাঁহার অকৈতব প্রেমের মধুময় স্পর্শে কাম তাহার কণ্টকমালা হইতে রিক্ত হইয়া পারিজাত-মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসুক, পূতিগন্ধময় তাহার অস্তিত্ব কলুষলেশহীন নিষ্পাপ-সুন্দর দিব্যসুরভি লইয়া বহির্গত হউক। যাহা ছিল তোমার গুপ্ত শত্রু, তাহা হউক তোমার, আমার, নিখিল বিশ্বের প্রতিজনের পরম কুশলকারী নিত্যবন্ধু।

(২০)

সত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্রহ্মচর্য্যের পরম-সহায়ক। সত্যই

ব্রহ্ম,—ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, ইহা মুনিগণের উপলব্ধি। সত্যে যে বিচরণ করে, ব্রহ্মে বিচরণ তার কেন কঠিন হইবে? সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কর। যে পরের প্রাপ্যের প্রতি অন্যায় ও লুব্ধ দৃষ্টি দেয় না, তাহার পক্ষে সত্যে সুদৃঢ় হওয়ার পথ সুগম। যে অন্যের প্রতি মনে বিদ্বেষ পোষণ করে না, তাহার পক্ষে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ। যে অপরের অনুগ্রহ-লাভের প্রত্যাশী নহে, নিজের কার্য্য নিজের শক্তিতেই সাধন করিতে চেষ্টিত, তাহার পক্ষেও সত্যে প্রতিষ্ঠালাভ সহজ। জগতের অধিকাংশ মিথ্যাই অসৎ পথে বস্তু লাভের লোভ হইতে সৃষ্ট হয়। যাহা সৎপথে লাভ করিতে পারিবে না, তাহার প্রতি যদি লোভ থাকে, মানুষ মিথ্যা কহিতে বাধ্য হয়। যাহার প্রতি বিদ্বেষ আছে, ক্ষমার মহিমায় যদি তাহার প্রতি অন্তরের শত্রুতা-বোধ প্রশমিত করিতে না পার, তাহা হইলে তাহাকে অপদস্থ, হতমান ও পরাভূত করিবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লইতে তুমি প্রলুব্ধ হইবেই। পরের অনুগ্রহের উপরে যাহার জীবনের উন্নতি নির্ভর করিবে, সে তোষামোদ ও চাটু-কারিতা করিবেই এবং নতজানু হইয়া নিজের বিবেক-বিরুদ্ধ অসত্যের অর্চ্চনা বারংবার করিবে। লোভ মনকে নীচ করে, মনকে সে চৌর্য্যের পথে ধাবিত করে। চৌর্য্যের কত সহস্র প্রকার ভেদ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে তুমি কোন কুমারী কন্যার সহিত গোপনে দেখা-

সাক্ষাৎ করিলে, আলাপ করিলে, গল্প স্বল্প করিলে। ইহাও তোমার চৌর্য্য। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমার চিত্ত স্বচ্ছ হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, অভিভাবককে না জানাইয়া কোনও কুমারী মেয়ের কাছে একখানা পত্র পাঠাইলেও তুমি চৌর্য্যের অভিযোগে পড়িতে পার। গোপনতা চোরেরই স্বভাব। চোর না হইলে তুমি এই অন্যায় গোপনতার পথ ধরিবে কেন? প্রকাশ্যে যাহা করিতে পার না, তাহাই গোপনে করিবার জন্য তুমি অগ্রসর হইতে পার মাত্র তখন, যখন তোমার ভিতরে চোরের স্বভাব আসিয়া গিয়াছে। গুপ্ত লম্পট আর তস্কর, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, লম্পট পরকন্যার বা পরনারীর মন চুরি করিতে চাহে, তস্কর তৈজস-পত্র অপহরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া যায়। গুপ্ত লম্পট সাধারণ তস্কর অপেক্ষা সমাজের বৃহত্তর অনিষ্ট-কারক। নিজেকে সর্ব্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিলে তোমার পক্ষে এমন দোষাবহ পথে পাদচারণা অসম্ভব হইবে। সত্যকে চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলিয়া সম্মান কর।

(২১)

কৌমার যৌবন সঞ্চয়ের কাল। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের শক্তিকে কেবল সঞ্চয়ই করিয়া যাইতে থাক। কৃপণ যেমন করিয়া কণা কণা সঞ্চয় করিতে করিতে একদা ধনী হয়, তুমিও তেমন কণা কণা করিয়া সামর্থ্য সঞ্চয় কর, ইচ্ছাকৃত অপব্যয় সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিয়া দাও, অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে

অপচয় ঘটিয়া গেলে তাহার সম্পর্কে মনকে একেবারে নিরুদ্বেগ রাখ এবং শরীর ও মনের প্রবল শক্তিমত্তাকে একদা তোমা-অপেক্ষাও দেহ-মনে শ্রেষ্ঠ বংশধরের আবির্ভাবের জন্য প্রাণপণে এবং সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া যাও। পুরুষত্ব তোমার কেমন যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহা পরীক্ষার জন্য প্রলুব্ধ হইও না, অবৈধ পথে এই পরীক্ষা একবার সুরু হইলে কদভ্যাস ও পাপাসক্তি তোমাকে চিরজীবনের জন্য ক্রীতদাস করিবে। নিজ নিজ পুরুষত্বের পরীক্ষা তুমি বিবাহিত হইবার পরে শত বার করিতে পারিবে, বিনা দ্বিধায় বিনা বাধায় পারিবে, কেহ তখন তোমাকে নিন্দা করিতে আসিবে না, এমন কি মাত্রা-জ্ঞান-রহিত হইয়া যদি না যাও, তাহা হইলে তোমার বিবেকও তোমাকে অভিযুক্ত করিবে না। দৃঢ়তার সহিত সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। সেদিন যদি দেখিতে পাও, পুরুষ হিসাবে কোনও দিক্ দিয়া তোমার যোগ্যতা কিছু ন্যূন, তাহা হইলে তখন-তখনই তাহা সংশোধন করিয়া লইবার কত পথ আছে। তাহা সুপথ, তাহা সুনিশ্চিত পথ। কোনও কুবন্ধুর প্ররোচনাতেই অনিশ্চিত পথ ও বিপথ আশ্রয় করিও না। তোমার একটী অণ্ডকোষ একটু ছোট বলিয়া ভয় পাইও না, তোমার জননেন্দ্রিয় একটু ছোট বা একদিকে একটু কাৎ হইয়া থাকে বলিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। কখনো কখনো জননেন্দ্রিয়ের চর্ম্মে শিরাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়

বলিয়াও দুশ্চিন্তা করিও না। এইগুলির একটাও কোন দুর্লক্ষণ নহে বা অস্বাভাবিক নহে। শরীরের অন্যান্য অংশেও যেমন রক্তচলাচলের গতি বুঝিয়া রক্তবহা ধমনীগুলি স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায়, জননেন্দ্রিয় সম্পর্কেও তাহাই সত্য বলিয়া জানিবে। এই জন্য দুশ্চিন্তা করিবার কিছুই নাই। আয়নাতে লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তোমার বাম দিকের মুখার্দ্ধ আর তোমার ডান দিকের মুখার্দ্ধ ঠিক সমান নহে; একদিক একটুখানি সুপুষ্ট, অপর দিক একটুখানি সুশুষ্ক। মস্তিষ্ক হইতে যে সকল শিরা-উপশিরা আসিয়া তোমার মুখমণ্ডলের আকৃতি-রক্ষা করিয়া যাইতেছে, তাহারা একদিকে কিছু বেশী এবং একদিকে কিছু কম ভাবে বণ্টিত হইয়াছে। ইহা ঈশ্বরেরই বিধানে হইয়াছে। তোমার জননেন্দ্রিয়েও তেমন ডানদিকের এবং বামদিকের শিরা-উপশিরাগুলি প্রায় সমভাবে বণ্টিত হইলেও তাহারই মধ্যে একটু উনিশ-বিশ আছে। এই জন্যই প্রতি প্রাণীরই জননাঙ্গ কোনও না কোনও দিকে এককণা হেলিয়া থাকে। পৃথিবীর প্রত্যেকটী পুরুষ-প্রাণী সম্পর্কে এই কথা সত্য। ইহাতে কোনও পুরুষের কোনও সময়ে নিজ জননাঙ্গ-সম্পর্কিত কর্ত্তব্য-পালনে কোনও বিঘ্ন হয় নাই। সুতরাং এই বিষয় নিয়া দুশ্চিন্তা করা এক মহামূর্খতা। তোমার দুইটী অণ্ডকোষই যদি সমান ভাবে ঝুলিয়া থাকিত; একটি একটু উপরে, একটি একটু নীচে না থাকিত, তাহা

হইলে উপবেশন করিবার কালে অণ্ডকোষে এমন চাপ পড়িতে পারিত, যাহার ফলে অনেক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। এই ক্ষতি নিবারণ করিবার জন্যই ভগবান্ নিজ হাতে এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহা কোনও রোগ নহে বা দুর্লক্ষণও নহে। যেই রজ্জু দিয়া অণ্ডকোষদ্বয় শুক্রাধারদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত, সেই রজ্জু দক্ষিণে ও বামে সমান দীর্ঘ নহে। একটী রজ্জু ছোট, একটী রজ্জু বড়। ইহা স্বভাবেরই নিয়ম। কাহারও অণ্ডকোষদ্বয় বা জনানঙ্গ ক্ষুদ্র, আবার কাহারও বা বৃহৎ, ইহাতে তাহাদের পুরুষত্বের তারতম্য হয় না। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার লিঙ্গও প্রয়োজন-সময়ে নিজ কর্ত্তব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে করিয়া থাকে, পাশ্চাত্য যৌন-তত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতেরা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উপরে পরীক্ষা চালাইয়া এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। অণ্ডকোষদ্বয় হইতেছে শুক্রনির্ম্মাণের কারখানা। ইহার ভিতরে সূক্ষ্মভাবে কত যে কলকব্জা কাজ করিয়া যাইতেছে, বলিবার নহে। ইহারা আকারে কিছু ছোট বা বড় হউক, ইহাতে যায় আসে না, ইহাদের ভিতরেও শুক্র-নির্ম্মাণকারী কারখানাটী ঠিকই আছে। কোনও কারখানা আকারে একটু ছোট বলিয়া নির্ম্মিত শুক্রের বিশেষত্বে কোনও তারতম্য নাই। ক্ষুদ্র-অণ্ডকোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তিরও একবারের শুক্র-নির্ঝরে বিশ কোটি শুক্রকীট বাস করে, বৃহৎ-অণ্ডকোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও তাহাই। তথাপি তোমরা পেটেণ্ট-ঔষধ

বিক্রয়কারীদের দ্বারা প্রচারিত বিজ্ঞাপন-পুস্তিকায় লিখিত প্রবন্ধাবলি পাঠ করিয়া এই সকল বিষয়ে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছ এবং যে যে বিষয়ের জন্য চিন্তা করার কোনও সঙ্গত কারণই নাই, তাহার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেছ। বিশ্বাস কর, এই সকল অমূলক ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। অসত্য ধারণার উপরে নির্ভর করিয়া নিজ গুপ্ত জীবনকে কোনও অনুচিত বা অস্বাভাবিক পরীক্ষার মধ্যে ফেলিও না। সর্ব্বপ্রযত্নে ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় পরিহার, অজ্ঞাত-সারে পরিত্যক্ত শুক্রাপচয়ের জন্য মন হইতে উদ্বেগ বর্জ্জন এবং সুসমঞ্জস খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়ামাভ্যাস, খেলাধুলা, যৌগিক আসন-মুদ্রার অনুশীলন, সচ্চিন্তার চর্চ্চা এবং ভগবদারাধনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া কেবলই দিনের পর দিন বলবর্দ্ধন করিয়া যাও। বলীয়ান্ হও, দুর্ব্বল থাকিও না।

(২২)

অজ্ঞাতসারে বীর্য্যক্ষয় হইয়া যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই নিবার্য্য ব্যাপার। উপযুক্ত যত্নশীল হইলে ইহার সংখ্যা এবং পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এই বিষয়ে যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলোপধায়ক। * নিয়মিত নিষ্ঠায় এই সকল প্রক্রিয়ার অনুশীলন করিলে অনিচ্ছায় শুক্রক্ষয় প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। ইহা সুপরীক্ষিত সত্য। প্রাণপণে চেষ্টা

* 'সংযম-সাধনা' ত্রয়োদশ সংস্করণের 'যৌগিক আসন-মুদ্রা' অধ্যায় (পৃষ্ঠা ---) দ্রষ্টব্য।

সত্ত্বেও কাহারও কাহারও নিদ্রাযোগে শুক্রক্ষয় সম্পূর্ণ রূপে দূর হয় না। কেননা, এক এক জনের শরীরের গঠনই পিতা-পিতামহের কাছ হইতে এক একটা বিশেষ ঢং নিয়া আসে। সেই ক্ষেত্রে হতাশ না হইয়া যার যতটুকু নিরাময় সম্ভব হইয়াছে, তাহার ভিত্তির উপরেই জীবনের সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় নিয়া অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করিতে বসাও এক প্রকারের মানসিক রোগ বলিয়া জানিবে। সুতরাং দুশ্চিন্তাকে মনের কোণেও ঠাঁই দিবে না। পাশ্চাত্য যৌন-তত্ত্ব-বিশারদেরা ত তাঁদের পুঁথি-পুস্তকের মারফৎ এই কথা অকুতোভয়ে প্রচার করিয়া যাইতেছেন যে, অনিচ্ছাকৃত শুক্র-ক্ষয়ে শরীরের বিশেষ কোনও অনিষ্ট হয় না, অবশ্য যদি ইহার মাত্রা কল্পনাতীত বাড়িয়া না যায়। সাধারণতঃ নিদ্রা-বিকারে অনেক সময়েই শুক্রের ক্ষয় অতি অল্পই হইয়া থাকে। নিয়ত প্রচ্ছন্ন কামের অধীন হইয়া চলার দরুণ কামগ্রন্থি (Prostate Gland) এবং কাউপারস্ গ্লাণ্ড (Cowper's Gland) হইতে নিঃসারিত রসই সাধারণতঃ নিদ্রা-বিকারের সময় বহির্নির্গত হইয়া থাকে। ইহা প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ড বা কাউপারস গ্ল্যাণ্ডের দুর্ব্বলতা-প্রযুক্তই হইয়া থাকে। কারণ, মূত্রনালীর ভিতর দিয়া শুক্র যাহাতে বিনা ক্লেশে প্রবাহিত হইয়া বাহিরে নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য দ্রুত আসিতে পারে, তাহার জন্য মূত্রনালীর পথকে পিচ্ছিল করিয়া দেওয়াই ইহাদের

প্রধান কর্ত্তব্য। এই রস ঘন এবং পিচ্ছিল হইলেও ইহা শুক্র নহে। সুতরাং যে সকল যৌগিক মুদ্রা অভ্যাস করিলে জননাঙ্গ-সম্পর্কিত গ্রন্থি (Gland) সমূহে বলাধান হইতে পারে, তাহা দ্বারাই এই জাতীয় নিদ্রাবিকার দূর হইতে পারে। সুতরাং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হইয়া অনুশীলনই কর্ত্তব্য। অণ্ডকোষ হইতে শুক্র নির্ম্মিত হইয়া * শুক্রকোষদ্বয়ে (Seminal Vesicles) যদি কেবলই যাইতে থাকে এবং এই শুক্রকে পুনরায় শরীর-মধ্যে শোষিত করিয়া লইবার যতটা ক্ষমতা স্বভাবতঃই দেহে রহিয়াছে বা সন্দীপনী মুদ্রা প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা গভীর ধ্যানের দ্বারা, সংকল্পের শক্তির দ্বারা এই পরিশোষণী ক্ষমতাকে যতটা পরিবর্দ্ধিত করিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহারও অধিক হারে যদি অণ্ডকোষে শুক্র উৎপন্নই হইতে থাকে এবং শুক্র-কোষদ্বয়ে চালান হইয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলে শুক্র-কোষদ্বয়ের মৌমাছির কুঠরীর মত সকলগুলি কুঠরী শুক্রে বোঝাই হইয়া যাইবার দরুন এই বোঝার ভার কমাইয়া দিবার জন্য শুক্রকোষদ্বয়ের মধ্যে একটা উত্তেজনা মাঝে মাঝে আসিয়া পড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তখন নিদ্রাকালে একটা স্বপ্ন-বিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া শুক্রকোষদ্বয় প্রবল ভাবে কুঞ্চিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে

* "সংযম-সাধনা"র ত্রয়োদশ সংস্করণে শুক্রক্ষয়ের" দেহ-তত্ত্ব" নামক অধ্যায়ে ২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

প্রষ্টেট গ্ল্যান্ড (কাম গ্রন্থি) এবং কাউপারস্ গ্ল্যান্ডও হঠাৎ কর্ম্মতৎপর হইয়া পড়ে। এভাবে যে নিদ্রাবিকার ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্যও কাহারও অস্থির অধীর না হইয়া, ইহাকে প্রশমিত বা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সাধ্যমত সকল সৎ-চেষ্টা করিয়া ফলাফল ভগবানের হস্তে অর্পণ-পূর্ব্বক,—"ভগবানের ইচ্ছায় যখন যাহা যেভাবে ঘটিবার ঘটুক, আমি নিজ ইচ্ছায় দেহ ও মনকে কিছুতেই কখনও কলঙ্কিত করিব না,"—এই সংকল্প নিয়া পথ চলিবে। যাহারা অত্যধিক দুশ্চিন্তা করে, তাহারাই দুর্ব্বল হয় বেশী। তুমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছ নিজেকে অবিকৃত রাখিতে, তার পরেও যদি শরীর হইতে সুপ্তিযোগে স্খলন হয়, তবে তার জন্য নিজেকে আর দায়ী মনে করিয়া দুঃখ-সঞ্চয় করিও না। ইহাকে অনুপযুক্ত দেহ-ধারণের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র মনে করিয়া ইহা সত্ত্বেও জীবনের পরম উন্নতির পথে বীরবিক্রমে ধাবিত হইবার আয়োজন কর। যদি তোমারই ন্যায় বিকারক্লিষ্ট কাহাকেও মনমরা হইয়া থাকিতে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকেও হতাশার পঙ্ক হইতে টানিয়া তোল, তাহাকে বিষণ্ণতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর। জগতের সকল যুবকদের লইয়া বিশ্বকল্যাণ মহাযজ্ঞে উৎসর্গ হইবার জন্য তোমরা সুনিশ্চিত মনে অগ্রসর হও।

(২৩)

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিও না। কারণ, এই

অবিশ্বাস তোমাকে কোন সম্পদই দিবে না। বিশ্বাস সর্ব্ব-সম্পদের আকর। কে জগৎকে সৃষ্টি করিলেন, কে বিশ্বজগৎ জুড়িয়া প্রতি অন্তরে বাস করিতেছেন, তাহাকে পাইবার জন্য জীব পতির সহিত, পত্নীর সহিত, ভ্রাতার সহিত, ভগিনীর সহিত, বন্ধুর সহিত, বান্ধবীর সহিত স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়া-মমতার অনুশীলন করিয়া যাইতেছে, পশু-পক্ষী তাহা জানে না। জানে না বলিয়াই তাহারা মানুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। নতুবা এক একটা ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার বিচারে মানুষ পশুপক্ষী-দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। এক মাইল উপর হইতে একটা পাখী ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে চলিতেও ধান-ক্ষেতের আড়ালে অতি ক্ষুদ্র কীটটিকেও দেখিতে পায়। এমন দৃষ্টি-শক্তি মানুষের নাই। তিন মাইল দূর হইতে বংশীধ্বনি শুনিয়া মৃগ পাগল হইয়া ছুটিয়া আসে। এমন শ্রবণ-শক্তি মানুষের নাই। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নানা রূপ জটিল পরিকল্পনার আড়া-আড়ি ভাবে বিদ্যুতের তার সাজাইয়া রাখিলে, তাহার মধ্য দিয়াও অন্ধ চামচিকা নিরাপদে ঘুরিয়া ফিরিয়া একবারও বিদ্যুৎপৃষ্ট না হইয়া গমনাগমন করিতে পারে। এমন অদ্ভুত স্পর্শ-শক্তি মানুষের নাই। মাটির উপরে পদক্ষেপের চিহ্ন মাত্র না থাকিলেও কুকুর গন্ধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া দশ মাইল বিশ মাইল দূরবর্ত্তী চোর বা অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। মিশ্রির ভাণ্ডে কোথাও ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র থাকিলে কত দূর-

দূরান্তর হইতে পিপীলিকার দল পাহাড়পর্ব্বত লংঘন করিয়া ছুটিয়া আসে। এমন ঘ্রাণ-শক্তি মানুষের নাই। নিজ প্রণয়িনীর সহিত সংসর্গে মত্ত হইলে ঘোটক এবং হস্তী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে কাটাইয়া দেয়, এমন সম্ভোগ-শক্তি মানুষের নাই। একটা গর্ত্তে বা বিবরে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে সর্প বা ভেক বৎসরাধিক কাল তাহাতে অনায়াসে বাঁচিয়া থাকে। এমন ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি মানুষের নাই। সকল রকমেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর অপেক্ষা এইভাবে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তথাপি মানুষের মত বড় কেহ নাই। কারণ, মানুষ সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়কে দেখিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাকে লক্ষ্য করিয়াছে, মানুষ নিজ জীবনের পরম লক্ষ্যকে বাহির করিবার পথ চিনিয়াছে।

তুমি সেই মানুষ। তুমি তোমার উপরে পরমেশ্বরের অধিকারকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিও। ইহাতে তোমার জীবনের দিব্য ভাব প্রস্ফুটনের অমিত সহায়তা হইবে। এই জন্যই ভল্‌টেয়ার বলিয়াছিলেন,—"If God did not exist, it would be necessary to invent Him" অর্থাৎ "যদি ঈশ্বর না থাকিতেন, তবে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া লইবার প্রয়োজন আমাদের হইত।"

(২৪)

ভগবানের নামে নিজেকে মজাও। ভগবানের প্রেমে

জীবনকে ভরপুর কর। তাঁহারই কাজে নিজেকে কর নিয়োজিত। বিশ্বের প্রতিজনের মধ্যে ভগবান্ আছেন জানিয়া তাঁহার সেবা কর। নিজেকে যে সেবায় লাগায়, ভগবান্ তাহার ব্রহ্মচর্য্য নিজের করুণায় পূরা করিয়া দেন। জগদ্-বাসীকে ভগবানের পুত্র কন্যা মাত্র বলিয়া ভাবিও না, ভাবিও ভগবানের অংশ বলিয়া। তাহা হইলেই সেবা নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক হইবে। সেবা করিতে গিয়া মোহে পড়িও না। তোমার সেবা এমন অকৃত্রিম ও অকপট হউক, যেন তাহা সকল মোহকে বিনাশ করে।

(২৫)

ভগবানের নামের অপেক্ষা মধুরতর বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে কিছু নাই। অথচ অভ্যাসের অভাবে ইহার মধুস্বাদ তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না। পিতৃশরীর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া মাতৃগর্ভে যখন প্রবেশ করিয়াছিলে, তোমার সূক্ষ্মাণু দেহ হইতে ভগবানেরই নাম অবিরাম ধ্বনিত হইতেছিল। পিতৃদত্ত সেই সূক্ষ্মাণু দেহ লইয়া মাতৃদেহস্থ ডিম্বমধ্যে যখন লীন হইলে, তখন সেই মহামিলনের পুণ্য ক্ষণে সমগ্র মাতৃ-জঠর জুড়িয়া ভগবানেরই নাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, রণিত-অনুরণিত হইয়াছিল। তোমার দেহের সৃষ্টি ভগবানের নাম-কীর্ত্তনের এক মহামহোৎসব। আর কেহ তাহার দর্শক ছিল না, তাহার পরোক্ষ সাক্ষী তোমার পিতার শরীরস্থ প্রতি রোমকূপ, প্রতি অণুপরমাণু, তোমার মাতার শরীরস্থ প্রতি রোমকূপ, প্রতি

অণুপরমাণু, আর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলে তুমি স্বয়ং। দশ মাস দশ দিন কেবল নামের স্পন্দনের মধ্য দিয়া তুমি দেহে মনে বাড়িয়াছ, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিতলে পতিত হইবা মাত্র ওঁয়া করিয়া ভগবানের নামের দোহাই দিয়াছ। মা, বাবা, দাদা, দিদি, ভাই, বোন্ ইত্যাদি নাম ধরিয়া নানা জনকে যে নানা নামে ডাকিলে, সেই ধ্বনিগুলি ভগবানেরই এক অনাদি শাশ্বত নামের প্রতিধ্বনি মাত্র। কথাগুলি চিন্তা করিয়া গ্রহণ করিও। কথাগুলি গ্রহণ করিয়া ভগবানের নামের প্রত্যক্ষ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করিও। সাধনের আনন্দে মনপ্রাণ প্রেমে ডগমগ করিয়া তুলিও। ভগবৎ-প্রেমের দিব্য আরতির আলোকে তোমার মনের সকল পঙ্কিল কামনা, সকল সর্পিল বাসনা, সকল কুটিল আকাঙ্ক্ষা, সকল তমোময়ী আসক্তি সকল অন্ধকার-পুষ্ট দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে, তুমি স্বল্প চেষ্টায় গৌরবোন্নত-শির- পূর্ণ-মানবে পরিণত হইবে।

(২৬)

ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠা মানুষকে কর্ম্মঠ করে, কঠোর করে। ব্রহ্মচর্য্যহীন কর্ম্মনিষ্ঠা মানুষকে নির্ম্মম করে, নিষ্ঠুরও করে। ভগবানে প্রেম মানুষকে কোমল করে, মধুর করে। তোমার ভিতরে কোমলতা এবং কঠোরতা সমভাবে বিরাজিত থাকুক, কিন্তু তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইও না। ভগবৎ-প্রেম তোমাকে মধুর করুক, স্নিগ্ধ করুক, সুন্দর করুক। কিন্তু

মনে রাখিও চখের জল আর ভগ্ন গদ্‌গদ কণ্ঠই সকল সময়ে ভগবৎ-প্রেমের প্রমাণ নহে। সংসারের সহস্র পীড়নে কাঁদিয়া মুখে "হরি-হরি" বলিয়া সেই অশ্রুকে প্রেমাশ্রু বলিয়া বাহিরে বিজ্ঞাপন জাহির করিবার দুর্ব্বলতা অনেকের থাকে। ভগবানের জন্য না কাঁদিয়াও তাহারা ভগবানের জন্যই কাঁদিতেছে বলিয়া সস্তায় লোকপ্রতিষ্ঠা আদায়ের চেষ্টায় আছে। এ প্রেম ভেজাল প্রেম। চাউলে কাঁকর মিশাইয়া, ডাইলে পাথর মিশাইয়া, ময়দায় সোপ-ষ্টোনের চূর্ণ মিশাইয়া, দুগ্ধে জল মিশাইয়া, ঘৃতে চর্ব্বি মিশাইয়া, সরিষায় শিয়াল-কাঁটার বীজ মিশাইয়া, কেশ-তৈলে হোয়াইট অয়েল মিশাইয়া, চিনিতে বালু মিশাইয়া, গুড়ে মাটি মিশাইয়া, পেট্রোলে কেরোসিন মিশাইয়া যাহারা কারবার করে, তাহারা যেমন দণ্ডযোগ্য অপরাধী, ভগবানের জন্য না কাঁদিয়াও যাহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ হইতে উৎপন্ন অক্ষিবারিকে প্রেমাশ্রু বলিয়া ভাণ করিতে চাহে, তাহারাও তেমন দণ্ডযোগ্য অপরাধী। তাহাদের আচরণের কেহ অনুসরণ করিও না। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় কপটতা ও মিথ্যাচারের স্থান নাই।

(২৭)

কৈশোরের স্বভাব সরলতা, স্ফূর্ত্তি, আনন্দ, উচ্ছল উন্মাদনা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাস্তবতাবর্জ্জিত কেবল স্বপ্নের জাল রচনা। যৌবনের স্বভাব আত্মবিশ্বাস, বিশ্বের সমস্ত মধু

আহরণ ও উপভোগের দুরাকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে অন্ধত্ব এবং বর্ত্তমানে, ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে, যাহা ভাল লাগিয়াছে, তাহাতেই ফলাফল-জ্ঞান-বিরহিত দুর্ব্বার বিলাস। বার্দ্ধক্যের স্বভাব শঙ্কা, প্রতি পদে হিসাব-নিকাশ, রঙ্গীণ বস্তু দেখিলে তাহার বাহ্য চাকচিক্যে অনাস্থা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ বৃথা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া অফুরন্ত অনুতাপ, এবং সহস্র অধঃপতন সত্ত্বেও একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই সকল অভাব-অপূর্ণতা কটাক্ষে পূরণ হইয়া যাইবে, এই বিষয়ে অগাধ বিশ্বাস, চূড়ান্ত আস্থা এবং নিঃশেষ নির্ভর। জীবনের এই তিনটি অবস্থারই ভাল ও মন্দের দিক আছে। কিন্তু তোমার জীবনের কৈশোরের সরলতা ও আনন্দ, যৌবনের আত্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্মক্ষমতা, বার্দ্ধক্যের বিচারশীলতা এবং ঈশ্বরে নির্ভর যুগপৎ বিকশিত হইতে পারে। এই যে বিকাশ, তাহাকে সম্ভব করিবার সাধনার নামই ব্রহ্মচর্য্য। নিজেকে বিকশিত কর শত সৎকর্ম্মে, নিজেতে বিশ্বাস রাখ প্রতিটি দুর্য্যোগে, পরমেশ্বরে নির্ভর কর প্রতি পদে, বিচার করিয়া করিয়া অসৎকর্ম্ম ত্যাগ কর, সৎকর্ম্মে হাতের মুঠি শক্ত করিয়া লাগাও। মিথ্যা এবং কপটতার সহিত আপোষ পরিহার কর এবং কি প্রকাশ্যে, কি গোপনে, নিজেকে পবিত্র ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার পণ কর।

(২৮)

নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু-বান্ধব কেহ-না-কেহ তোমাকে দৃষ্টান্ত

দেখাইয়া শুনাইয়াছে,—"কেন মহাশয়, অনেক অব্রহ্মচারী ব্যক্তিও ত' লোক-সমাজে বড় হইয়াছেন, প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, জন-সমাজের উপরে নেতৃত্ব করিয়াছেন। তবে আমাদের ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার" আবশ্যকতা কি ?" স্বীকার করি, হয়ত কেহ অব্রহ্মচারী, অসংযমী, কদাচারী ও দুর্নীতিতে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ভাল ভাল বহি লিখিয়াছেন বা হুজুগের মুখে কোনও বিরাট আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের অনাবশ্যকতা সম্পর্কে ইহাই একটা অকাট্য যুক্তি হইতে পারে না। নিজের জীবনে যিনি দুর্নীতিকে পরোয়া করেন নাই, তিনি নিজের অন্তরে এজন্য বিমল শান্তির আস্বাদন করিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ কি তোমার হাতে কিছু আছে ? থাকিলে তাহা দেখাও। নিজের জীবনে যিনি অসংযম-কে গ্রাহ্য করেন নাই, এমন প্রতিভাবান্ পুরুষেরও বার্দ্ধক্যে অসংযমের কুফল ভুগিতে হয় নাই, এমন দৃষ্টান্তই বা তুমি কয়টা দেখাইতে পারিবে ? অসামান্য কবি, বক্তা বা লেখকরূপে সম্মান পাইয়াও তাঁহারা মানুষ-রূপে সকলের পূজার পাত্র হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত দেখাও। কবি বলিয়া যাঁহাকে জয়ন্তী উৎসবে পূজা করি, নিজ ভগিনীকে তাঁহার কাছে পাঠাইতে হয়ত কুণ্ঠা, শঙ্কা, আতঙ্ক অনুভব করি। এই পূজা কি নিতান্তই লোক-দেখান একটা অভিনয় নয় ? অসংযম, দুর্নীতি ও কদাচারকে নিজ নিজ জীবনে প্রশ্রয় দিয়াও যাহারা কাব্যে,

সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দার্শনিক আলোচনায়, ভাষণে ও আন্দোলন-বিশেষের নেতৃত্বে দক্ষতা দেখাইয়াছেন বা দেখাইতেছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটি শক্তির আনুকূল্য পাইয়া তাহা করিয়াছেন। প্রথমতঃ স্বভাবদত্ত প্রতিভা তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ একই কাজে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছে। এই দুই অনুকূল শক্তির সহিত যদি তাঁহাদের আত্মসংযম-সাধনের, ইন্দ্রিয়-সংযম অনুশীলনের, ভোগান্ধতা দমনের পদ্ধতিবদ্ধ প্রয়াস যুক্ত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতিত্ব শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়া জগতের মহত্তর কল্যাণ-সাধন করিতে পারিত। ইন্দ্রিয়াসক্তি কাব্যের জন্মদাত্রী নহে, কোনও কোনও কবির স্বাভাবিক কাব্যানুশীলন-জীবনের সহিত তাঁহাদের অসংযত বেপরোয়া জীবন যুক্ত হইয়াই মানুষের মনে মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দুশ্চরিত্র না হইলে কেহ কখনও কাব্য, সাহিত্য, চিত্র আদি সুকুমার শিল্পের সাধনা করিতে পারে না। মিথ্যা ধারণাকে সত্য বলিয়া কল্পনা করিও না। দুশ্চরিত্রেরাও যদি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমরা সচ্চরিত্র জীবন যাপন করিয়া তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাহিত্য রচনার যোগ্য হইতে পার। অনুশীলনে একনিষ্ঠা এবং স্বভাবদত্ত প্রতিভা, এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটিলে তোমার আত্ম-সংযম তোমাকে দিয়া শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি সম্ভব করিবে।

(২৯)

হুজুগে অনেকেই মহৎ কর্ম্মে আত্মদান করিয়া থাকে। এই আত্মদানও নিশ্চিতই তুচ্ছ করিবার মত জিনিষ নহে, কেননা আত্মদান দ্বারা আত্মদাতার চিত্ত-শুদ্ধি হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন জীবন দিয়া দিলাম, ইহা অপেক্ষাও দামী আত্মদান হইতেছে, আদর্শের রূপায়নে নিজেকে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তিলে তিলে ক্ষয়িত করিয়া নিঃশব্দে অপার ধৈর্য্য সহকারে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গেলাম। এই জাতীয় নীরব কর্ম্মীদের প্রায়ই কোনও আন্দোলনের পুরোভাগে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাদের মধ্যে নীরব কর্ম্মের এই অসাধারণ যোগ্যতার সঞ্চার করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের সাধন নিতান্ত নির্গুণ ব্যক্তিকেও নানা লোভনীয় গুণরাজির সমাবেশে আকর্ষণীয় করিয়া দেয়। প্রয়োজন একনিষ্ঠ প্রযত্নের, প্রয়োজন ধৈর্য্যের, আর প্রয়োজন নিজের নিজত্বকে সেবা-কার্য্যের প্রাধান্যের পশ্চাতে স্থাপনের।

(৩০)

ব্রহ্মচারীর লক্ষ্য থাকে আত্মসুখ-বর্জ্জনে। অসংযমীর লক্ষ্য থাকে আত্মসুখ-সাধনে। দুই ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্যগত এই নিদারুণ পার্থক্যের দরুণ একই আন্দোলনে দুই জনের কর্ম্ম-রীতি এবং কর্ম্ম-পরিণতির মধ্যে দুইটী পৃথক্ রূপের প্রকাশ হয়। সংযমী তিল তিল করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে, —

অসংযমী ঝোঁকের মুখে আত্মদান করে, ঝোঁক থামিয়া গেলে পশ্চাদপসরণ করে। হুজুগে আন্দোলন জমে, ব্রহ্মচারী-অব্রহ্মচারী-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য ইহাতে স্থান আছে কিন্তু হুজুগ যখন কমিয়া যায়, অব্রহ্মচারীরা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যায়, ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের বলে তখন আন্দোলনকে স্থায়ী করে। যে আন্দোলনে ব্রহ্মচর্য্যের সম্মান নাই, ব্রহ্মচর্য্যের সমাদর নাই, ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তাবোধ নাই, সেই আন্দোলনে যোগদানকারীদের নানা প্রসুপ্ত আকাঙ্ক্ষা 'দেশসেবা' 'জনসেবা' প্রভৃতির দোহাই দিয়া উন্মত্ত তাণ্ডবে কাজ করিয়া যায়। তারপরে যখন নিজ নিজ বাসনানুযায়ী ভোগসুখ-চরিতার্থতার নিরাপদ সুযোগ আসিয়া যায়, তখন যার যার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া লইয়া নিভৃত বিজন-পথে অপরের দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে কর্ম্মীরা একে একে সরিয়া পড়ে। হোমকুণ্ডের অর্দ্ধোজ্জ্বল অগ্নি ঘৃতাহুতির প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া শেষে মনের দুঃখে নিভিয়া যায়।

(৩১)

কর্ম্ম-বৈরাগ্য অনেক সময়ে অব্রহ্মচর্য্যের ফল। কর্ম্ম-বৈরাগ্য হতাশারই নামান্তর। কর্ম্ম কর এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়া মনের সকল কাম-বিকার-প্রসূত কুচিন্তাকে সুপথে পরিচালিত কর। কামোত্তেজনা যদি আসে, তাহাকে পাপ বলিয়া মনে করিও না। এই কামোত্তেজনাকে বিশ্ব-শুভঙ্কর কল্যাণকর্ম্মে

রূপান্তরিত করিয়া দিবার চেষ্টাকে পুণ্য বলিয়া মনে করিও। যাহা স্বাভাবিক ভাবে মানব-মনে জাগে, তাহাকে পাপ আখ্যা দিও না। কিন্তু তাহাকে উন্নততর পরিণতি দিবার সাধনাকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া সম্মান করিও।

(৩২)

কাম তোমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে বলিয়া হতাশ হইয়া যাইও না, হা-হতোঽস্মি করিও না। তোমার ভিতরে যে সৃষ্টির ক্ষমতা আসিতেছে, তোমার অন্তরের কাম-চিন্তা মাত্র সেই সংবাদটির বাহক। কাম-চিন্তার আধিক্যকে ইহার অধিক মূল্য দিও না, ইহার অধিক মর্য্যাদা দিও না। কাম-চিন্তা আসিতেছে, আসুক, তুমি কাম-ক্রিয়া হইতে নিজেকে ততকাল বিরত রাখ, যতকাল কামক্রিয়া তোমার পক্ষে ধর্ম্মজনক বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম-রূপে আসিয়া আত্মপ্রকাশ না করিবে। বিবাহিত পুরুষের পক্ষে নিজ পত্নীর সহিত কামজ মিলনের ধর্ম্মীয় সমর্থন আছে, সামাজিক সমর্থন আছে, দাম্পত্য আত্ম-প্রসাদের ও দাম্পত্য-মনোমিলনের দিক দিয়া সার্থকতা আছে। অবিবাহিতের পক্ষে তাহার মধ্যে একটা দিকেরও কোনও সমর্থন নাই। তাই, তোমার ভিতরে যে সৃষ্টির ক্ষমতা আসিয়াছে, মনের নানাবিধ ভাব-বৈচিত্র্য সেই সংবাদ তোমাকে দিয়া গেলেও বিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি সেই সংবাদকে কোনও সম্মান দিতে পার না। দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। সহরের রাস্তা দিয়া যখন

হাঁটিয়া যাও, তখন পথে পথে কত জন কত জিনিষের বিজ্ঞাপন তোমার হাতে গুঁজিয়া দেয়। এই সকল বিজ্ঞাপিত জিনিষ-গুলির প্রায় প্রত্যেকটাই তোমার জীবনে কখনো না কখনো হয়ত কাজে লাগিবে। কিন্তু ইহাদের একটারও প্রয়োজন এখন নাই। এমত অবস্থায় সেই বিজ্ঞাপন দেখা মাত্রই কি তুমি দোকানে ছুটিয়া যাও জিনিষ কিনিতে? দোকানে তুমি যাও না। তুমি কেবল স্মরণে রাখ যে, লেপ-তোষক এই দোকানে পাওয়া যায়, মাদুর-শীতলপাটী ঐ দোকানে পাওয়া যায়, সেতার-এস্রাজ এহ দোকানে পাওয়া যায়, পুঁথি-পুস্তক ঐ দোকানে পাওয়া যায়। তুমি তখন কেবল জানিয়া রাখ যে, কোথায় কি পাওয়া যায়। তোমার ভিতরেও যে মাঝে মাঝে কামচিন্তার প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে থাকে, তাহাও,—তোমার দেহের মধ্যে ভোগের ক্ষমতা আসিতেছে, নূতন জীবসৃষ্টির যোগ্যতা আসিতেছে, কিছুকাল পরে বিবাহিত হইয়া দাম্পত্য সুখ অর্জ্জনের সামর্থ্য আসিতেছে,—এই আগমনী বার্ত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বার্ত্তা শুনিয়া তোমার প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। যখন কামোপভোগ তোমার পক্ষে বৈধ ও বিবেক-সম্মত হইবে, তখন যেন ইহাকে পরিপূর্ণ ভাবে আস্বাদন করিবার যোগ্যতা হইতে তুমি শারীরিক বা মানসিক দিক্ দিয়া বঞ্চিত না হইয়া যাও. তাহার জন্যই সুতীব্র সংকল্পে তোমাকে আত্মগঠন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া

আজীবন সন্ন্যাসী থাকার সুযোগ অথবা প্রয়োজন জগতের প্রত্যেকের হয় না। জগতের অধিকাংশ নরনারীকেই গৃহী হইতে হইবে। পরিপূর্ণ সামর্থ্য লইয়া বীর্য্যবান্ বীরের মত সগৌরবে গৃহীর জীবন যাপনের জন্যই এখন তোমার ব্রহ্মচর্য্য-পালন আবশ্যক।

(৩৩)

কাম এবং প্রেম মূলতঃ একই বস্তু। তাহাদের পার্থক্য শুধু বাহ্যতঃ। বাহ্যতঃ যে পার্থক্যটুকু তাহাদের রহিয়াছে, তাহারই দৌলতে কাম ক্ষয়কারক, প্রেম ক্ষয়পূরক; কাম দুর্ব্বলতাবিধায়ক, প্রেম সবলতাসঞ্চারক; কাম উত্তেজক, প্রেম প্রশান্তিদায়ক; কাম অধৈর্য্যউৎপাদক, প্রেম সহিষ্ণুতার ধারক, বাহক ও প্রসারক; কাম হতাশা-প্রদায়ক, প্রেম আশার কিরণে জীবন-পরিস্নাপক। কাম তোমাকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় অধীর করে, প্রেম তোমার ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা প্রশমিত করে। কাম তোমাকে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর করে, প্রেম তোমাকে পরার্থ-পর ও বিশ্বতোমুখ করে। কাম তোমাকে ক্ষণসুখে বিহ্বল বিমুগ্ধ বিমূঢ় করে, প্রেম তোমাকে নিত্য সুখের পানে আকৃষ্ট করে। কাম তোমাকে আত্মসুখের যূপকাষ্ঠে বলি দেয়, প্রেম তোমাকে আত্মসুখ-বলির মধ্য দিয়া বিশ্বসুখের কেতনরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কাম তোমাকে ক্ষুদ্রতার পঙ্কে নিমজ্জিত করে, প্রেম তোমাকে ভূমার অমৃতে অবগাহন করায়। কাম

কূপ, প্রেম মহাসমুদ্র। কাম এবং প্রেমে পার্থক্য কোথায়, নিয়ত ইহা চিন্তা করিও। ইহা চিন্তা করিতে করিতে দেখিবে অন্তরের কলুষ তেমনি করিয়া তোমার গা হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে সরিয়া পড়িয়া যাইতেছে, যেমন করিয়া পিপীলিকার পাল কর্পূরের গন্ধ পাইলে দূরে সরিয়া যায়, যেমন করিয়া মাথার উৎকুন ন্যাপ্‌থালিনের গুঁড়ার গন্ধ পাইলে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বাঁচায়। কাম অনিত্য, প্রেম নিত্য ; কাম অশুদ্ধ, প্রেম শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ ; কাম চঞ্চল, প্রেম শাশ্বত ; কাম প্রতিদান চাহে, প্রেম নিষ্কাম। কাম পরিণামে ঘৃণা, অনুতাপ, বিদ্বেষ এবং অসন্তোষ জন্মায়, প্রেম ফোটায় আত্মশ্রদ্ধার প্রসন্ন পারিজাত।

(৩৪)

অনাঘ্রাত পুষ্পের দিকে তাকাও। চাহিয়া দেখ, পরমেশ্বরের পবিত্র মুখখানাই যেন শতবর্ণে বিরঞ্জিত হইয়া লহরে লহরে হাসিতেছে। এ হাসি যে দেখিবে, সে-ই মুগ্ধ হইবে, সে-ই ত্রিতাপ-জ্বালা ভুলিবে। নিষ্পাপ কুমারীর মুখপানে তাকাও। দেখিবে, সেই মুখখানাও একটী অনাঘ্রাত পুষ্পেরই বিমল সৌন্দর্য্য। এই মুখখানার মধ্যেও পবিত্রতা-স্বরূপ পরমেশ্বরের মুখের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুমারীর এই দিব্য বিভায়, এই পবিত্রতায় অন্যায় হস্তক্ষেপ কেহ যেন কোথাও না করিতে পারে, তাহার জন্য বজ্রধারী হও। কুমারীর পবিত্রতাকে রক্ষার জন্য যে কোনও বিপদ বরণ কর।

(৩৫)

প্রকাশ্যে যাহা করিতে পার না, প্রচ্ছন্ন ভাবে যাহা করিতে হয়, তেমন কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে জীবন হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও। হয়ত বলিবে, মলমূত্র ত্যাগও ত' কেহ প্রকাশ্য ভাবে করে না, তাই বলিয়া কি মলমূত্র ত্যাগ করাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে? না, তাহা করিতে হইবে না এবং তাহা করা সম্ভবও নহে। পশু-পক্ষীরা ত' মলমূত্র ত্যাগ প্রকাশ্যেই করে, ইহাকে তাহারা অন্যায় বা লজ্জাকর মনে করে না। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে অনেকগুলি কাজই অপরের সমক্ষে করার রীতি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই নিষিদ্ধতার পশ্চাতে অনেক মূল্যবান্ সামাজিক কারণ এবং যুক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি রহিয়াছে। কিন্তু এমন বহু প্রচ্ছন্ন কার্য্য রহিয়াছে, যাহাকে অন্যায় ও ক্ষতিকর বলিয়া তোমার বিবেকই তোমাকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিয়া দেয়। তেমন প্রতিটি কার্য্য হইতে নিজেকে একেবারে শত যোজন দূরে রাখিবে। অন্যে জানিতে পারিল না বলিয়াই অন্যায় কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইয়া যায় না। লোকের চোখে ধূলা দিতে পারিয়াছ বলিয়াই পাপকার্য্য পুণ্যানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় না। তুমি যে জানিয়া ফেলিয়াছ যে, তুমি অহিতকর অনুচিত অসঙ্গত কাজ করিতেছ, ইহাই ত' এই কার্য্য পরিত্যাগ করিবার স্বপক্ষে অতি প্রবল যুক্তি। তোমার পিতা-মাতা

তোমার গোপন জীবন জানেন না, তোমার শিক্ষকবর্গ তোমার কোনও প্রচ্ছন্ন কার্য্যের সংবাদ রাখেন না, এজন্য তাঁহারা তোমাকে অতিশয় ভাল ছেলে বলিয়া গর্ব্ব করেন,—ইহা দ্বারাই তুমি ভাল ছেলে হইয়া যাও না। তুমি নিজে যখন জানিবে যে, তোমার প্রকাশ্য বা গোপন কোন কর্ম্মের মধ্যেই বিবেকের কণামাত্র দংশন নাই, একমাত্র তখনই তুমি মনে করিবার যোগ্য হইলে যে, তুমি ভাল ছেলে হইয়াছ। পিতামাতা ভাল ছেলের গৌরব করিতে চাহেন। শিক্ষক ও উপদেষ্টারা ভাল ছেলেকে প্রশংসা করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন। তুমি সত্য সত্য ভাল ছেলে হইয়া তাঁহাদের এই সাধ পূর্ণ কর। তোমার আত্ম-পরিচয়ে যেন আত্ম-প্রতারণা না থাকে।

(৩৬)

পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত আমাদের কলহ নাই। সেই শিক্ষার যাহা উদ্দেশ্য, তাহার সহিতই মাত্র আমাদের বিরোধ। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহস্র প্রকারের প্রশংসনীয়তা থাকিলেও এই শিক্ষা মানুষকে আত্ম-সুখের জন্যই প্রধানতঃ প্রলুব্ধ এবং যোগ্য করিয়া তুলিতেছে। ভারতীয় শিক্ষা আমাদিগকে, দেহের জন্য নহে, আত্মার জন্য তৈরী করিতে চাহিয়াছে। আমাদের ভিতরে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নিশ্চিহ্ন না হইলেও সংস্কৃতিগত-ভাবে আমরা বিশ্বজনের সুখের জন্যই কাতর। পাশ্চাত্যদের ভিতরে ব্যক্তিগত ভাবে অসংখ্য পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত থাকিলেও

সংস্কৃতিগত-ভাবে তাহারা আত্মসুখের জন্যই কাতর। শিক্ষার উদ্দেশ্যগত পার্থক্য এই ভাবে প্রাচ্যে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যে অন্তরের আবেদন-গত এই পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই জন্যই দেখিতে পাইতেছি, ভারতীয় যৌন-বিশারদ ঋষিরা চরক-বাৎস্যায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত প্রতি জনেই বলিতেছেন,—"বাল্যে ও কৈশোরে পবিত্র থাকিবে, যৌবনের উন্মেষে সর্ব্বপ্রকার শুক্রক্ষয়কর ব্যসন হইতে আত্মরক্ষা করিবে, বিবাহিত হইয়া পূর্ণ বীর্য্যে সংসারী করিবে, প্রৌঢ়ত্ব আসিলে শুক্রক্ষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, পুনরায় নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া সম্ভব হইলে সেই শক্তি "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মণি আত্মানং জুহোমি" বলিয়া অর্পণ করিবে। কৈশোরে এবং যৌবনের প্রথম অংশে যে কামাতুরতার পাশ-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার সাধনা করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার দেহের মঙ্গলেরই জন্য নহে, তোমার আত্মারও মঙ্গলের জন্য, এবং সমগ্র জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য। যৌবনের পূর্ণতায় যে পত্নীসহ সংসার-সুখ উপভোগ করিয়াছ, তাহাও তদ্রূপ। বার্দ্ধক্যে পুনরায়, কেবলই দেহের পানে চাহিয়া নহে, আত্মার পানে চাহিয়া বিশ্বের কুশলের মুখ তাকাইয়া পুনঃ সাধনায় ব্রতী হইতেছ। দেহের সঙ্গত সুখকে তুমি উপেক্ষা করিও না, কিন্তু তোমার সর্ব্বসুখের আস্বাদন বিশ্বসুখেরই জন্য।"

যদিও আচার্য্যে আচার্য্যে উপদেশের ভঙ্গিমায় বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে কতক কতক পার্থক্য রহিয়াছে, তথাপি ভারতের মোটামুটি আদর্শ ইহাই।

সেই আদর্শকেই তোমাদের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, যৌবনে প্রাণপণ যত্নে কদভ্যাস বর্জ্জন করিয়া ইচ্ছাকৃত শক্তিক্ষয় নিবারণ করার চেষ্টার মধ্যে একটা মহৎ তাৎপর্য্য আছে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে,—বিবাহিত হইবার পরে স্ত্রীসঙ্গ করিবার বৈধ অধিকারকে কাজে আনার মধ্যেই মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা নহে, অবিবাহিত অবস্থায় শুক্রক্ষয় করিয়া গেলেও যদি বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখের কোনও বাধা না হয়, তথাপি কুমার-জীবনে শুক্রধারণের চেষ্টা করার একটা অর্থ আছে। যেখানে মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিগত সুখটুকুকেই আদর্শ করে, সেখানে তাহার হিসাব-নিকাশ অতি সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যেই থাকিয়া যায়। বহু পাশ্চাত্য যৌন-তত্ত্ব-আলোচনাকারীর গ্রন্থে যে অনেক সময়ে এমন সকল কথা পাওয়া যায় যে, কৈশোর ও যৌবনে অবিবাহিত অবস্থায় কিছু শক্তিক্ষয় করিলে তেমন গুরুতর অন্যায় কিছু হয় না, তাহার কারণ এই যে, বিবাহ করিবার পরে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়কেও নানা কৌশলে সতেজ করিয়া যদি স্ত্রী-সম্ভোগ-সম্পর্কিত কর্ত্তব্য, চূড়ান্ত তৃপ্তি দিয়া এবং পাইয়া করা যায়, তবে আর অন্য কিছু

নিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। যুক্তিটা যেন কতকটা এইরূপ হইল,—ছাগীটার প্রয়োজনের সময়ে ছাগটা যদি তাহার পূর্ণ যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারিল, তবে আর ভাবিবার আবশ্যকতা নাই যে, ইহার পূর্ব্বে ছাগটা কোথায় কি ভাবে কি করিয়াছে। যে সকল যৌনতত্ত-আলোচনা-কারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁহাদের এই মুণ্ডহীন যুক্তির অবতারণা করিতেছেন, দেখা যাইতেছে যে, যৌন-বিজ্ঞান 'শাস্ত্র' হিসাবে ইঁহাদের আলোচ্য হইলেও যৌন-ব্যাপার নিয়া যাহারা অশান্তিতে আছে, এমন লোকদের যৌন-চিকিৎসা দ্বারা জীবকার্জ্জনই ইঁহাদের অধিকাংশের সাদরে গৃহীত ব্যবসায়। এই কারণেও ইঁহাদের যুক্তি মাঠে মারা যাইতেছে।

এই সকল রতি-শাস্ত্র বিশারদেরা বলিতেছেন,—"বিবাহিত জীবনে যাহারা সুখ আস্বাদনে অক্ষম হইয়াছে, তাহারা অতীতে কি করিয়াছে না করিয়াছে, তাহা নিয়া দুশ্চিন্তা না করিয়া আমাদের নিকটে আইস। আমরা এমন সহজ সরল কৌশল সব বলিয়া দিব যে, অতৃপ্তা পত্নীকেও তোমরা পূর্ণ তৃপ্তি দিবে, অসমর্থ দেহেও তোমরা বিপুল সামর্থ্য পাইবে। মানুষের যৌন-জীবনের এমন অনেক নিগূঢ় রহস্য আছে, যাহা মানুষ জানে না বলিয়াই জীবনকে দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত করে।" এই প্রসঙ্গেই তাঁহারা কেহ সোজাসুজি কেহ একটু পরোক্ষ ভাবে শুনাইয়া থাকেন যে, "বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী

জীবনে কৃত যেই সকল কাজকে ঢাকঢোল পিটাইয়া নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, তাহা তেমন অনিষ্টকরই বা কত, নিন্দনীয়ই বা কেন? যে কাজ অনেকেই করে, সেই কাজকে স্বাভাবিকই ত মনে করা উচিত! সেই কাজ করিবার সময়ে তাহাদের মনে যে লোক-শেখান পাপ-বোধ থাকে, সেই পাপবোধের জ্বালাই ত তাহাদের ভবিষ্যতের দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য-পালনের বিষম বিঘ্ন হইয়া নানা অশান্তির সৃষ্টি করে! পাপ-বোধকে দূর করিয়া দিতে পারিয়াছ ত আর কোনও বিঘ্নের বালাই-ই নাই!"— সমাজ-শাসন এবং ধর্ম্মের অনুশাসন যৌন-ব্যাপারে নীতিবোধ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ইঁহারা এই দুইটিকেও কটাক্ষ করেন।

কিন্তু যে সকল গৃহস্থেরা একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া ছাগল বা কুকুর উৎপাদন করায়, তাহারা বংশবৃদ্ধির জন্য নির্দ্দিষ্টকরা ছাগ বা কুকুরটীকে কেন সযত্নে আলাদা করিয়া রক্ষা করে? বীর্য্যের অনুচিত অপচয় যে পশুরও যোগ্যতা কমায়, ইহা একজন অতি সাধারণ ছাগোৎপাদক বা কুকুরোৎপাদক চাষীও জানে। মানব-সমাজেও যে বীর্য্যের অনুচিত অপচয় এইরূপ ভাবেই ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহার সমর্থন করিবার জন্য কি আরও অকাট্য যুক্তির প্রয়োজন আছে।

মোট কথা, পাশ্চাত্যের আদর্শই হইল,—"যতক্ষণ বাঁচিব, ততক্ষণ ভোগ করিব। বিবাহিত হইয়া ত ভোগ করিবই,

অবিবাহিত অবস্থায়ই বা ভোগের পথে নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মের, গীর্জার প্রচারকদের, নীতি-বাগীশ অভিভাবকদের এত উন্নাসিকতা কেন মানিব ? ভোগের কামনাকে কেবল চাপিয়া রাখিয়া রাখিয়াই কি আমার নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক রোগের সৃষ্টি হইতেছে না ?"

অপিচ, ভারতের আদর্শ হইল,—"মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর। এই জীবনটী পাইবার এমন একটী বিশেষ সার্থকতা আছে, যাহা পশুপক্ষীর জীবনে নাই। জীবন থাকিতে থাকিতেই সেই পরম সার্থকতাকে লাভ করিতে হইবে। সুতরাং বিবাহিত-জীবনের কর্ত্তব্য সুষ্ঠুতররূপে প্রতিপালন করিয়া যাইবার যোগ্যতা-সঞ্চয়ের জন্য আমি অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। আবার, বিবাহিত জীবনে পত্নীর সহ যে নিবিড় সুখভোগ করিব, তাহাকেও ইহা অপেক্ষা স্থায়িতর দিব্যতর, গভীরতর সুখেরই প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা, তাহারই সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য আমি ভগবানকে করিব জীবনের ধ্রুবতারা এবং তাঁহারই হাতে দিব আমার জীবনরথের সারথির রজ্জু।"

স্থায়ী লক্ষ্যে ও অস্থায়ী লক্ষ্যে যে পার্থক্য, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীতে আর পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই পার্থক্যটুকু রহিয়াছে। এই কারণেই পাশ্চাত্যের বিবাহ দেখিয়া-চাখিয়া তবে স্থির হয়, ভারতের বিবাহে বিবাহার্থী নিজের রুচি

খাটাইতে পরাঙ্মুখ, গুরুজনের নির্ব্বাচনই যথেষ্ট। দাম্পত্য জীবনের মধ্যে শারীরিক সুখকে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়া যাইবার পথে অবিবাহিত ব্যক্তিদের পূর্ব্বাচরণের পাপস্মৃতিকে বাধা-রূপে দেখিতে পাইয়া পাশ্চাত্য যৌন-বিশারদগণ কুমার-জীবনে খোলা মনে পাপ করিয়া যাইতে পরোক্ষ প্ররোচনা দিতে প্রলুব্ধ হইতেছেন, অথচ পাশ্চাত্য রতিশাস্ত্রের চূড়ান্ত গবেষণার পরেও আজ পর্য্যন্ত এমন একটী কথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা ভারতের বাৎস্যায়ন ঋষি তাঁহার কামসূত্রে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই না বলিয়া রাখিয়াছেন বা যাহা এখনও দাম্পত্য রহস্য-রূপে তান্ত্রিক সাধকদের গুপ্ত জীবনের প্রত্যক্ষ আস্বাদনের মধ্যেই না জীবিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষও দাম্পত্য জীবনের সুখকে উপভোগের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়া যাইবার কৌশল আবিষ্কার সম্পর্কে উদাসীন ছিল না, তথাপি তাহার আদর্শ কৌমার-জীবনে পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য-পালন।

ভারতীয় যুবক, তোমাকে ভারতের আদর্শেই জীবন গঠন করিতে হইবে। ভারত সংসার-বৈরাগ্যের প্রতি পক্ষপাতশীল দেশ হইলেও তোমাদের বিবাহিত জীবনে যথোচিত কালে সঙ্গত ভাবে চূড়ান্ত দেহ-সুখ আস্বাদনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই, অসময়ে অসঙ্গত ভাবে বীর্য্যক্ষয় করিয়া দুর্ব্বল হইতেই মাত্র নিষেধ করিতেছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ তুমি করিতে পার না।

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

দেহ না থাকিলে তুমি আত্মার পরিচয় পাইতে না। দেহ আছে বলিয়াই তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ যে, এই দেহের ভিতরে "তুমি" আছ। সেই"তুমি" দেখিতে কেমন, তাহা তুমি এখনও জান না। কিন্তু তুমি অনুমান করিতে সমর্থ হইতেছ যে, এই দেহকে যেমন সহজে দেখিতে পাওয়া যায়, দেহের ভিতরে "তুমি" নামে পরিচিত যিনি আছেন, তাঁহাকে তেমন সহজে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেহ সসীম কিন্তু সেই "তুমি" অসীম। "তুমি" অসীম বলিয়াই তোমার শ্লাঘা, সম্মান, মর্য্যাদা এবং আত্মপ্রসাদ অসীম হইবে। তুমি তোমার জীবনের প্রতিটি পাদ-সঞ্চালনে তোমার এই অসীমত্বের ধারণাটীকে সঙ্গে লইয়া চলিও। দেখিও, ইহারই ফলে তুমি তোমার অজ্ঞাতসারে বারংবার পাপের কূপে পতিত হইবার দারুণ সম্ভাবনা-সমূহকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছ। নিজেকে অসীম বলিয়া জান। দেখিবে, তোমার এই অসীমত্ব-বোধই তোমাকে হাতে ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিপদ-সাগর উত্তরণ করাইয়া দিতেছে।

দেহ আছে বলিয়াই তাহার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করিয়া তুমি তোমার অসীম সত্তা সম্পর্কে সম্বিৎ লাভ করিতেছ। এই দেহ তুচ্ছ নহে। ইহার অনাদর তুমি করিতে পার না। ইহার

অপচয় করিতেও পার না। ইহাকে ইহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যে লাগাইতে হইবে, নিকৃষ্ট আচরণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। তোমার নিজের কুশলের জন্য এবং জগতের কল্যাণের জন্য তোমার পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন।

(২)

নিজেকে সম্মান করিতে শিখার মত বড় কাজও কিছু নাই, প্রয়োজনীয় ব্যাপারও কিছু নাই। আত্মসম্মান-জ্ঞান না থাকিলে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল স্রোতের তৃণের মত, ঝড়ের পাতার মত, অপরের ইচ্ছায় দূর হইতে দূরান্তরে পরিচালিত হয়। যত বালকের জীবনে দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়া তাহার প্রবেশ-পথ রচনা করিয়াছে, প্রত্যেকটীতেই তাহা হইয়াছে কেবল নিজের প্রতি প্রগাঢ় সম্মান-বোধ জাগ্রত না হওয়ায় এবং অপরের কোনও বাক্য, ব্যবহার, ইঙ্গিত বা আকর্ষণের মধ্য দিয়া এই সম্মানের মহিমা কোথাও খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে কিনা, সেই বিষয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টি না থাকায়। জগতের শ্রেষ্ঠ জীব তুমি, পরমেশ্বরের তুমি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, নিজেকে তুমি কখনও পরবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইতে দিতে পার না।

(৩)

স্পর্দ্ধিত অহমিকার মানে আত্মশ্রদ্ধা নয়। তোমার যে

একটা মূল্য আছে, তুমি যে বাজারের সস্তা চীজ নহ, এই বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাসেরই নাম আত্মশ্রদ্ধা। তুমি নিজের উপরে যতখানি মূল্য ও মহিমা আরোপিত করিবে, ভগবানের দয়ায় ততখানি মূল্যবান্ ও মহিমান্বিত তুমি হইবে। নিজেকে ছোট করিয়া দেখা, নিজেকে খেলো বলিয়া জানা যে তোমার আত্মোন্নতির কত বড় বিঘ্ন, তাহা বলিবার নহে। নিজের মূল্য নিজে জান না বলিয়াই ত সামান্য প্রলোভনে দুর্ব্বল হইয়া যাও। নিজের মর্য্যাদা নিজে বোঝ না বলিয়াই ত একজন সঙ্গীর বা খাতিরের লোকের অনুরোধে হঠাৎ করিয়া ঢেকী গিলিয়া ফেল। নিজেকে শ্রদ্ধা কর, নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা অটুট, অচল, ক্রমবর্দ্ধমান রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে প্রয়াসী হও। যে কার্য্য করিলে নিজের কাছে নিজেকে দোষী, অপরাধী, হীন বলিয়া মনে হয়, তাহার অনুশীলন একেবারে বন্ধ করিয়া দাও। তেমন চিন্তা, তেমন বাক্য, তেমন কৌতূহল, তেমন আসক্তিকে জীবনের অঙ্গন হইতে বাহির করিয়া দাও। আপাদমস্তক থাক পরিচ্ছন্ন, আমৃত্যু কর শুভ্রতার সাধনা, আজীবন থাক অন্তরে বাহিরে দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ বলিয়াই তুমি জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহ, মানুষেরও মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবার সাধনার পথ তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে বলিয়াই তুমি জীবশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের শ্রেষ্ঠদের মধ্যেও তোমার মস্তক সকলের অপেক্ষা

উন্নত রহিবে, এই সংকল্প লইয়া জীবনের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে যে তোমার শাশ্বত অধিকার, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মেরই জন্য যে তোমার মানবদেহ-ধারণ, শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া যে তোমার পক্ষে অবমাননাকর, এই বিশ্বাসে দৃঢ় হওয়ারই নাম আত্মশ্রদ্ধ হওয়া। তোমরা তাহাই হও।

(৪)

আত্মশ্রদ্ধা সচ্চরিত্রতার খুঁটি। আত্মশ্রদ্ধা যাহার টুটিয়াছে, নিজের মূল্যকে যে কম করিয়া দেখে, ক্ষণসুখের প্ররোচনাকে সে উপেক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। সুখলোভ মনুষ্য-জীবনে কোনও অস্বাভাবিক কার্য্য নহে, অন্যায়ও নহে কিন্তু ক্ষণসুখ দিয়া তোমার কি হইবে? অকালে আম পাড়িলে যে সুখ, আম্র সুপক্ব হইলে কি তাহার শতগুণ সুখ আস্বাদিত হয় না? অকালে ফুল ফুটাইলে কি তাহাতে সৌরভের লেশমাত্রও পাওয়া যায়? তুমি যতখানি মহিমান্বিত, তোমার সুখও তেমনই মহিমান্বিত হওয়া চাই। তুমি যে তুচ্ছ নহ, এই বিশ্বাস তোমার থাকিলে অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, অতি নিকৃষ্ট স্তরের সুখকে পাইবার জন্য কি করিয়া তুমি তোমার সচ্চরিত্রতায় জলাঞ্জলি দিতে পার? মনুষ্য-শরীরে যত প্রকারের সুখানুভবের ক্ষমতা আছে, মনুষ্য-সমাজেও তত প্রকারের সুখানুশীলনের বৈধ স্বীকৃতি আছে। যে সুখই তোমার কাম্য হউক না কেন, তাহাই পাইবার সুযোগ

সামাজিক জীবনের মধ্যে দেওয়া আছে। কিন্তু সকল সুখই সকল সময়ে অনুশীলনীয় নহে। উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় যাহারা ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে, তাহারাই সম্যক্ সুখ লাভ করে। কিন্তু এই জন্যই সকলের আগে চাই আত্মশ্রদ্ধা, আত্মসম্মানবোধ, নিজের জীবনের জাগ্রত মহিমায় সুগভীর বিশ্বাস এবং নিজ ভবিষ্যতের অনন্ত গরিমায় পরিপূর্ণ আস্থা,—এই সকল মূল্যবান্ বস্তু হইতে নিজেকে কখনও কোনও কারণেই বঞ্চিত রাখিও না। শ্রদ্ধাবান্ কেবল জ্ঞানই লাভ করে না, শ্রদ্ধাবান্ লাভ করে সাফল্যের পর সাফল্য, বিজয়ের পর বিজয়, অভ্যুদয়ের পর অভ্যুদয়। দুর্ব্বার তার গতি, অপরাজেয় তার পৌরুষ।

(৫)

চতুর্দ্দিকের প্রতিকূল অবস্থা-নিচয় দেখিয়া নিজেই যদি নিজেকে হতাশায় কর পরিত্যাগ, কামনা-বাসনার কুটিল দূতেরা যখন তোমাকে চারিদিক হইতে বন্ধন-রজ্জু লইয়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিতে আরম্ভ করে, তখন নিজেই যদি তোমার করযুগ মুক্ত করিয়া বন্ধন করিবার জন্য দাও আগাইয়া, নিজেই যদি ফাঁসীর দড়ি পরিবার জন্য ভীরু কাপুরুষের মত তোমার গলা দাও বাড়াইয়া, তাহা হইলে তোমার এই বিপদে বাহির হইতে কে আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারে? এই সময়ে

আত্মরক্ষার সহায় তোমার অন্তরের ভিতর হইতেই অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে। সেই সহায় তোমার আত্মশ্রদ্ধা।

নিজেকে জীবনে কি একটী দিনের জন্যও মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতে শিখ নাই? অতীত স্মরণ করিয়া দেখ,— একটী মুহূর্ত্তের জন্যও কি তোমার কখনও মনে জাগে নাই যে, তুমি গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইবার জন্য নহ, অপরে যাহা করে, তাহা করিবারই জন্য তুমি নহ, অপরের অন্ধ অনুকরণের জন্যই তোমার জন্ম নহে, সাধারণের মিছিলের মাঝখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার জন্যই তুমি নহ? কখনও কি জীবনে একটী নিমেষের জন্য তোমার ভাবিবার কারণ ঘটে নাই যে, তুমি মহৎ, তুমি উন্নত, তুমি শ্রেষ্ঠ? একটীবারের জন্যও কি তোমার এ কথা মনে হয় নাই যে, মহৎই তোমাকে হইতে হইবে, হইতে হইবে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, হইতে হইবে জগৎ-শ্লাঘ্য, জগৎপূজ্য?

যদি কখনও ইহা হইয়া থাকে, তবে জানিবে, সেই সুদুর্ল্লভ মুহূর্ত্তটী তোমার জীবনের এক পরমপুণ্যক্ষণ। সেই মুহূর্ত্তটীর উদ্দেশ্যে অন্তরের সমগ্র ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়া প্রণাম কর এবং বল,—"হে শুভক্ষণ! হইয়াছ তুমি অতীত, তবু আমি তোমাকে আমার ধ্যানে জাগাইয়া রাখিব, আমি তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে তোমার কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিব, বর্ত্তমানের মোহান্ধকারাবৃত নির্জ্জীবতার অবসান ঘটাইব।"

(৬)

তোমার এই দেহটার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি এত বড়, এত মহৎ যে, দেহের কোনও প্রকার সুখানুশীলন দিয়াই তাঁহার তৃপ্তিসাধন সম্ভব নহে। কিন্তু দেহকে যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় চলিতে না দিয়া তাঁহারই বিচক্ষণ দৃষ্টির অধীনে থাকিয়া চলিতে দাও, তাহা হইলে তিনিই এমন অবস্থা-সমূহ সৃষ্টি করিয়া দিবেন, যাহাতে তোমার দেহ-রূপ বিন্দুর মধ্যেই সুখের পরমসিন্ধু উথলিয়া উঠিতে পারে। এই কথাটী তোমার প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। তাঁহারা ইহা জানিতেন বলিয়াই দেহটাকে সর্ব্বদা সংযমের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে অযথা পরিচালনা হইতে বাঁচাইয়া চলিতেন, ইন্দ্রিয়সুখের স্পৃহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া ইচ্ছানুযায়ী পরিচালন করিতেন। এই জন্যই কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-লব্ধ সমগ্র শক্তি দিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের হইত। এই জন্যই গার্হস্থ্য জীবনকে যথোপযুক্ত উপভোগে লিপ্ত রাখিয়াও বানপ্রস্থ-জীবনে পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য পালন অর্থহীন হইত না। এই জন্যই বানপ্রস্থ আশ্রমে পুনরায় প্রচুর শক্তিসঞ্চয় করিয়া তারপরে তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বকুশলের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিজেদিগকে তিলে তিলে সর্ব্বজীবের শুভকার্য্যে বিলাইয়া দিতে সামর্থ্যেরও অভাব থাকিত না, মনেও কুণ্ঠা আসিত না।

তোমরা আত্মপ্রসাদদাতা চিত্ততৃপ্তিকর সেই মহনীয় আদর্শ ভুলিয়া যাইও না।

(৭)

ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে তাহার খুঁটিনাটি দিয়া বিচার করিও না। তাহাকে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ দিয়া বিচার কর। পরমা রূপসী বিশ্বসুন্দরীকেও যদি তাহার খুঁটিনাটি দিয়া বিচার আরম্ভ কর, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিলেও তাহার মধ্যে অনেক কদর্য্যতা বাহির হইয়া পড়িবে। হিমালয় দেখিতে আসিয়া তাহার বিরাট মহান্ মহিমার কর জয়গান, কোথায় কোন্ একটী ক্ষুদ্র পাথর ফাটিয়া গিয়া কোৎসিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, কোথায় কোন্ মদশ্রাবিণী লতার দুর্গন্ধে পথ পরিক্রম হঠাৎ অপ্রীতিকর হইয়াছে, তাহার হিসাবে যাইও না। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য থাকিতে পারে কিন্তু ভারত-সভ্যতার ন্যায় অভ্রভেদী শুভ্রতার মহিমা তাহার নাই। ভোগ তাহার লক্ষ্য, —ভারতের সনাতন আদর্শ ত্যাগ।

সেই ত্যাগের দেশে তুমি জন্মিয়াছ, এই আত্মশ্রদ্ধাটুকু তোমার থাকা আবশ্যক। এই দেশে জন্মিয়া ভূমার জন্য অল্পকে ত্যাগ করা তোমার স্বাভাবিক সামর্থ্যের মধ্যে প্রলোভনের লালসাময়ী চপলতাকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া তোমার যে জন্মগত যোগ্যতার ভিতরে! বৃহৎ প্রাপ্তির জন্য ক্ষুদ্র লোভকে দমাইয়া

দিতে তোমার পক্ষে নিদারুণ মানসিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া পাদচারণার আবশ্যকতা পড়ে না।

এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধা তোমার থাকা প্রয়োজন।

কেন তুমি দুর্ব্বল হইবে? কেন তুমি পরাজিত হইবে? কেন তোমার সর্ব্ব অঙ্গে পরাভবের অগৌরব আঠার মত লাগিয়া থাকিবে? বিশ্বাস কর তুমি সবল,—এই একটী বিশ্বাসই তোমাকে সবল করিবে। বিশ্বাস কর তুমি বিজয়ী, এই একটী বিশ্বাসই তোমাকে বিজয়ী করিবে। বিশ্বাস কর তুমি সকল পরাজয়, পরাভব, পরাস্তির ঊর্দ্ধে অবস্থিত,—এই একটী বিশ্বাসই তোমাকে করিবে সম্রাট্, যাঁহার সমক্ষে সকলে হয় নত কিন্তু যে কাহারও নিকটে বশ্যতা-স্বীকার করে না।

প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা তোমাকে অনমনীয় আত্মশ্রদ্ধা দিবে। নিজের প্রতি অনুপম শ্রদ্ধা তোমাকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বীরের মত উন্নতমস্তকে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে চলিবার দিবে বল, দিবে সাহস, দিবে যোগ্যতা। —আত্মশ্রদ্ধ হও।

(৮)

অপরে তোমাকে প্রশংসা করিল, কি নিন্দা করিল, তাহার পানে তাকাইও না। নিজের নিকটে যাহাতে নিজে প্রশংসিত থাকিতে পার, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হও। এমন কিছু

কখনও করিও না, যাহার দ্বারা তোমার নিজের দৃষ্টিতে তুমি খাটো হইয়া যাও। নিজের কাছে নিজে ছোট হওয়ার চাইতে দুর্ভাগ্য মনুষ্য-জীবনে আর কিছু নাই। নিজের বিবেকের নিকটে যে নিষ্পাপ, জগতের কে তাহার কি করিতে পারে? নিজের দৃষ্টিতে যে মহৎ, মূল্যবান্ ও পবিত্র, জগতে কোন্ মহতী ঋদ্ধি সে লাভ না করিতে পারে?

(৯)

জগতের পূজ্য নরনারীদিগকে অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা দিও, কারণ, মহৎকে সম্মান করিলে তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব তোমার ভিতরে একটু একটু করিয়া প্রবেশ করিবার পথ করিয়া লইবে। কিন্তু নিজের নিকটেও নিজে সম্মাননীয় থাকিবার চেষ্টা করিও, কেননা নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে যেদিন করিবে ভুল, সেই দিনই তোমার দ্বারা অনীপ্সিত অপকার্য্যের অনুষ্ঠান অতি সহজ ব্যাপার হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, দুর্নীতিতে আসক্ত, পাপানুষ্ঠানে গৌরববোধকারী ব্যক্তিদের নিন্দা করিয়া রসনাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু তাহাদের বল্গাহীন জীবনের জাকজমক দেখিয়া মনে মনে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও পোষণ করিও না, যে যাহার কুৎসা করে, সে তাহার মতন হইয়া যায়। আবার, যে যাহাকে শ্রদ্ধা করে, সেও তাহার মতন হইয়া যায়। তুমি যদি নিজেকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা করিতে পার, তাহা হইলে জগতে তুমি অতুলনীয় হইয়া

থাকিবে ; কারণ, তুমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহার সহিত কাহার তুলনা সম্ভব ?

(১০)

যে-কেহ তোমার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আসুক, চাই সে শিক্ষক-রূপেই আসুক, বন্ধুরূপেই আসুক,—তাহাকে এতটা অন্তরঙ্গ হইতে দিও না, যাহাতে সে তোমার আত্মশ্রদ্ধার বিনাশকারী হইতে পারে বা তোমাকে কুক্রিয়াসক্ত করিতে পারে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ হইতে কুশিক্ষা পাইবার যেমন সহস্র দৃষ্টান্তের কথা শুনিতে পাই, শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রের চরিত্র-ক্ষতির কথাও তেমন কম শুনি না। মোহ আসিলেই পতন হইবে। ইহার কখনও অন্যথা হইতে পারে না। ছাত্রের প্রতি স্নেহ বা বন্ধুর প্রতি প্রেম যখন মোহের পথে চলে, তখন ইহা সর্ব্বনাশ আনয়ন করে। তোমার শিক্ষক, তোমার বন্ধু দুই দিন পরে যখন নিজের পথে চলিয়া যাইবে, তখন একাকী তুমি পড়িয়া থাকিবে সকল কুশিক্ষার কুৎসিত ফল আহরণ করিয়া জন্ম ভরিয়া কাঁদিয়া মরিবার জন্য। তোমার অন্যায়ের কুফল ইহারা কেহ ভাগ করিয়া নিবে না। সুতরাং বন্ধু-নির্ব্বাচনে সাবধান হইও। যাহার সংস্পর্শে গেলে তোমার নিজের নিকটে নিজের সম্মান কমিয়া যায়, তাহাকে বন্ধু মনে না করিয়া শত্রু বলিয়া গণনা করিও। আত্মশ্রদ্ধার চাইতে বড় বন্ধু যে তোমার আর কেহ নাই, এই কথা মনে প্রাণে স্বীকার করিও।

(১১)

যে বন্ধু তোমার গুণ দেখিলে প্রশংসা করে কিন্তু দোষ দেখিলে তিরস্কার করে না বা তোমাকে আত্ম-সংশোধন করিয়া লইবার জন্য সাহায্য বা প্রেরণা দেয় না, সে তোমার বন্ধু কিনা বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। কেন সে তোমার দোষগুলি দেখিলে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকে আর একটু গুণ পাইলে ভ্রমরগুঞ্জন সুরু করিয়া দেয়? তাহার মনে কি কোনও মন্দ অভিসন্ধি আছে? সে কি চাটুকারিতা করিয়া তোমার প্রিয় হইয়া শেষে তোমার কোনও নিদারুণ নৈতিক ক্ষতি সাধনের ফিকিরে আছে? তাহার উদ্দেশ্য যদি সৎ হইবে, কেন সে তোমার দোষগুলিকে শাসন না করিয়া উপেক্ষা করে বা প্রশ্রয় দেয়? সে নিজেও যদি অসৎ না হইবে, তাহা হইলে তোমার আচরণে অনেক অন্যায় থাকা সত্ত্বেও সে কেন, হয় তোমাকে সংশোধন করিতে, নয় তোমাকে পরিহার করিতে, চেষ্টা করে না? যাহাকে অসৎ বলিয়া মনে হইবে, মুখে তাহার নিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন করিয়া চলা তোমার আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। লোকের কাছে নিন্দা গাহিয়া বেড়াইলে তোমার মূল্য বাড়িবে না, কিন্তু ইহাদের সংসর্গ বর্জ্জন না করিলেই বা তোমার কুশল কোথায়?

প্রবন্ধ যৌবন

(১২)

তোমরা স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করিলে আমরা তোমাদের প্রশংসা করি, পরীক্ষায় ফেল করিলে আমরা তোমাদের নিন্দা করি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তোমরা ভাল ছেলে, না মন্দ ছেলে, তাহা তোমাদের পরীক্ষার নম্বরের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। জ্ঞান-বিদ্যা-হীন মানুষ পশুর সমান। সুতরাং তোমাদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই বিদ্যার্জ্জন ও জ্ঞানলাভ একান্ত আবশ্যক। তাই স্কুলেরই বল আর কলেজেরই বল, পড়াশুনা তোমাদের মনোযোগ সহকারেই করিতে হইবে এবং কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইতে হইবে। পিতামাতা অনেক আশা করিয়া তোমাদের বিদ্যালয়ে পাঠান এবং তোমাদের বিদ্যার্জ্জনের সুযোগ দানের জন্য নিজেরা কষ্ট ও কৃচ্ছ্র স্বীকার করেন। এমতাবস্থায় যাহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবে বা ভাল ফল করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে মাতৃ-পিতৃ-ভক্তিহীন অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করা উচিত। বিদ্যার্জ্জন করিবার জন্য তোমরা যত্নশীল ও মনোযোগী হইবে, এই কথার ত কোনও প্রতিবাদই চলে না। কিন্তু ইহার পরে আরও জিনিষের আবশ্যকতা আছে, যাহা না থাকিলে বিপুল বিদ্যাবত্তাও মিথ্যা হইয়া যায়। তাহা হইতেছে, সৎকর্ম্মে রুচি এবং অসৎকর্ম্মে অরুচি, সৎ-কর্ম্মে শ্রদ্ধা এবং অসৎকর্ম্মে অশ্রদ্ধা, সৎকর্ম্মে নিরতি এবং অসৎকর্ম্মে বিরতি, সৎকর্ম্মে

আনন্দ এবং অসৎ-কর্ম্মে অনিচ্ছা। পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তোমাদের দিয়া অসৎ কর্ম্ম করাইয়া লইতে পারিবে না, হত্যা করিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইলেও তোমরা এমন কাজে লিপ্ত হইবে না, যাহা করিলে নিজের সম্মান কমিয়া যায়,— তোমাদের চাই এমন সুদৃঢ় মনোবল। এমন মনোবল যাহাদের আছে, তাহারাই ব্রহ্মচারী হইতে পারে, ব্রহ্মচর্য্য ভীরু দুর্ব্বলের সাধনা নহে। আমাদের উচিত তখনই তোমাদিগকে হাততালি দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা, যখন আমরা দেখিতে পাইব যে, নিজেদের মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তোমরা প্রাণপাতে প্রস্তুত। বিদ্যার্জ্জনে তোমাদের নিকটে যে নিদারুণ একনিষ্ঠা আমরা প্রত্যাশা করি, নিজ চরিত্রে সৎকার্য্যের সমাবেশ-সাধনে এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার অসৎকার্য্যের বিলোপ-বিধানে তোমাদের নিকটে আমরা তাহাই চাহি।

(১৩)

বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য। যাহা পালন করিলে তোমার বীর্য্যধারণের সহায়তা হয়, বীর্য্যক্ষয়েচ্ছা দমনের সামর্থ্য বাড়ে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য। সুতরাং সচ্চিন্তা, সৎসঙ্গ, সদালাপ, সদা-প্রফুল্লতা, সৎসাহস ও সত্যানুসরণ যেমন ব্রহ্মচর্য্য, আসন-মুদ্রা, ডন-কুস্তি, খেলা-ধূলা, নিঃস্বার্থ পরোপকার, বিপন্ন-উদ্ধার ও নির্দ্দোষ আনন্দ-বিতরণও তেমন ব্রহ্মচর্য্য। বন-পর্ব্বত-গুহা-বাসী ঋষিগণের আবিষ্কার বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যকে এতকাল যাহা

মনে করা হইত, তাহার দরুণ ব্রহ্মচর্য্য-পালনের কথা শুনিলে আতঙ্কে অনেকের হৃৎকম্প হইত। আমি অভয় দিতেছি, হৃৎকম্পের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে জটা-বল্কল ধারণ করিতে হইবে না, গৈরিক-অজিনাসনেরও প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হইতেছে এই দেহটীকে ভগবানের আরাধনার পবিত্র মন্দির বলিয়া জ্ঞান করা। নিজের দেহকে ভগবানের মন্দির বলিয়া যে যত অধিক নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিতে পারিবে, তাহার ব্রহ্মচর্য্য তত সহজে সংসিদ্ধ হইবে। বাহিরের ফষ্টিনষ্টির নাম ব্রহ্মচর্য্য নয়, ভিতরের পবিত্রতারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। মনের পবিত্রতা-সাধনে যে সিদ্ধকাম হইয়াছে, তাহার মনের ভিতরে হঠাৎ কখনও কুচিন্তা আসিয়া পড়িলেও তাহা তাহার ভিতরে আসক্তি, লালসা, ভোগেচ্ছা বা চঞ্চলতা জন্মাইতে পারে না, – যেমন শরতের আকাশে মেঘ থাকিলেও তাহাতে আকাশের সৌন্দর্য্য-নাশ ঘটে না। দেহ যাহার নিকটে দেব-মন্দির হইয়াছে, তাহার মনে কাম-চিন্তা স্থায়ী হইবে কি প্রকারে? দেহের প্রতিও অন্তরের শ্রদ্ধা রাখিও। দুদিনের জন্য ইহা পাইলেও অনন্ত কালের অকথনীয় সুখ, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি পাইবার ইহা সহায়ক হইবে। দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভের সার্থকতা সম্পাদনে দেহের এই বিশিষ্ট যোগ্যতা আছে বলিয়া যে বোধ, তাহা হইতেই ভারতে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ দেখ, এই ভারতীয়

আর্য্য-জাতিরই অপর দুই সগোত্র আর্য্যবংশধর গ্রীক ও রোমক জাতি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শৌর্য্যে, শিল্পে জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কল্পনাই করিতে পারেন নাই। ভারতের ব্রহ্মচর্য্য-পালন-প্রথা ভারতের উন্নাসিক নৈতিকতার ফল নহে, ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠতম সত্য-দর্শনের ফল। ব্রহ্মচর্য্য পালনকে কুসংস্কার মনে করিও না, বোকামি মনে করিও না, অপ্রয়োজনীয় মনে করিও না। ইহাকে জীবন-বঞ্চনা বলিয়াও মনে করিও না। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে আতপান্ন আর কাঁচকলাসিদ্ধে অত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহার কারণ তাঁহাদের মূর্খতা বা একদেশদর্শিতা নহে। বীর্য্যধারণ তোমাকে বলীয়ান্ করিবে, বলবানের গৃহেই বলবানেরা জন্মগ্রহণ করিবে। আকৌমার-ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যে দিন তুমি গৃহী হইবে, সেই দিন তোমার গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ তোমার সহচারী অব্রহ্মচারীদের সুখের অপেক্ষা দশ গুণ গভীর এবং বিশগুণ প্রগাঢ় হইবে। অসময়ে নিজেকে ক্ষয়িত করিয়া যে প্রকৃত সময়ে অক্ষম হয়, তাহার মতন দুর্ভাগ্য আর কাহার ? বজ্রবন্ধনে কৌপীন আঁট, শরীরের সারবস্তুর অন্যায় অপচয় তুমি হইতে দিবে না।

(১৪)

দেহকে এমন পবিত্র রাখ, এত পরিচ্ছন্ন রাখ, এত সতর্ক সেবায় রাখ, যেন কুচিন্তা আর রোগ এই দুইটীর একটীও

ইহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। যত থাকিবে নীরোগ, ব্রহ্মচর্য্য পালনে তোমার সামর্থ্য তত বাড়িবে। শরীরের মধ্যে দুর্ব্বলতা আর মনের মধ্যে আত্মঅবিশ্বাস কখনো থাকিতে দিবে না।

(১৫)

তোমার শিক্ষকদের মুখে ব্রহ্মচর্য্যের কোনও উপদেশ তোমরা শুনিতে পাও না বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে আগ্রহ অনুভব করেন, যেন তাঁহাদের ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হয়, বীর্য্যক্ষয়কর সকল অসৎ আচরণ হইতে নিজেদের দূরে রাখে, নিষ্পাপ দেহে তাদের যেন নিৰ্ম্মল মন বিরাজ করে। কারণ, ইহা হইলে ছাত্রদের স্মৃতি ও মেধা বাড়িবে, ফলে ছাত্ররা পড়াশুনায় ভাল হইবে। কোন্ শিক্ষক না চাহেন যে, তাঁহার ছাত্রগণ বিদ্যার্জ্জন করিয়া কৃতিত্বশালী হউক ? কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে কোনও কথা কহেন না, কারণ, দেশে পরিস্থিতি অনুকূল নহে। হয়ত যাঁহার পুত্রকে সংযত ও সদাচারী করিবার জন্য তিনি মুখব্যাদান করিয়াছেন, তিনিই আসিয়া তাঁহার বাক্ রুদ্ধ করিয়া দিবেন। অভিভাবকদের মনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগে নাই, শিক্ষকেরা দূর হইতে দুঃসাহস করিবেন কেন ? কিন্তু এজন্য কি অভিভাবক, কি শিক্ষক, কাহাকেও

তোমরা দোষ দিও না। দোষ প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের, যাঁহারা সমাজের মধ্যে ছোট-বড়-মাঝারী গুরু হইয়া সমাজের অধিকাংশ মানবকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান বিতরণের ভাণ করিতেছি। অভিভাবক ও শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বজনীন-ভাবে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উপকারিতা ও উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়া আমাদেরই প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। শিক্ষকেরা নিজেরা অন্ধতা বশতঃ, অজ্ঞতা বশতঃ, চিন্তার দৈন্য বশতঃ, যে বিষয় বুঝিবার কোনও চেষ্টাই করিতেছেন না, সেই বিষয় সকলকে বুঝাইবার দায়িত্ব যে আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। মেধাবী পুত্র পড়ায় খারাপ হইয়া গেলে পিতা-মাতারা পাড়ার অন্য ছেলেকে দোষ দেন, নিজের বাঁশের ঝাড়ে যে ঘুণে ধরিয়াছে, তাহা একবার অনুমান করিয়াও দেখিতে চাহেন না। ইঁহাদের সতর্কতার অভাব তোমাদের অনেকের পদস্খলনের জন্য দায়ী। কিন্তু কে কিসের জন্য বেশী দায়ী আর কম দায়ী, সেই বিচারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ আত্ম-সম্মান-বোধের অভাবকেই দায়ী কর। যাহার আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আছে, সে কখনও পাপ-কার্য্যে আসক্ত হয় না। ভুল সে কখনও হয়ত করিতে পারে, কিন্তু তাহার আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ তাহাকে দিয়া দ্রুত আত্মসংশোধন করাইয়া লয়।

(১৬)

তোমাদের লক্ষ্য হউক নিখিল মানব-জাতির দুঃখ বিদূরণ।

তোমাদিগকে যখন স্বদেশ-সাধনার বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দেই, তখনও আমার লক্ষ্য আসমুদ্র-হিমাচল-সীমিত ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ-টুকুই নহে, পরন্তু সমগ্র জগৎ। একদিন এই পৃথিবীর মত আরও কত কোটি কোটি পৃথিবী বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের পরিধিতে আসিবে, তাহাদের সকল অধিবাসীদের লইয়া যে বিরাট বিশাল বিপুলায়তন মনুষ্য-জাতি, তাহাদেরই সকলের দুঃখ-মুক্তি-কামনাকে পুরোভাগে রাখিয়া তোমাদের বলিতেছি, "তোমরা ব্রহ্মচারী হও, বীর্য্যশালী হও, বলীয়ান্ হও।"

(১৭)

যুক্তি দেখাইতেছ যে, বিবাহিত ব্যক্তি যেমন পরিমিত স্ত্রীসঙ্গে দুর্ব্বল হয় না, ঠিক তেমন অবিবাহিত ব্যক্তিও পরিমিত শুক্রক্ষয়ে দুর্ব্বল হয় না। যুক্তির দিক্ দিয়া তোমার উক্তি নিশ্চয়ই ঠিক্। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি যাহাতে পরিমিত ভাবে চলে, তাহার সহায়তা অধিকাংশ সময়ে তাহার স্ত্রীই করিয়া থাকেন। পুরুষের অপরিমিত অসংযম স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর, ক্লেশকর বা অনেক সময়ে অরুচিকর বলিয়া বিবাহিত পুরুষ তাহার স্ত্রীর ব্যবহারেই সংযত থাকিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীরা কেবলই স্বামীদের বক্ষরক্তপানকারিণী রাক্ষসী নহেন, তাঁহারা স্বামীর প্রাণরক্ষিণী দেবীও বটেন। অন্ততঃ ভারতবর্ষে অধিকাংশ স্ত্রীরাই দেবী-স্বভাবা। যাহারা রাক্ষসী-স্বভাবা, তাঁহারাও মাঝে মাঝে দেবীর স্বভাব অনুবর্ত্তন করিয়া

থাকেন। ফলে বিবাহিত জীবনে সংযত হইবার প্রয়োজন পড়িলে স্ত্রীর কাছে স্বামীরা সংযম-ব্যাপারে সহায়তা পান। চিকিৎসক যদি আসিয়া বলিয়া যান যে, স্বামীর দুর্ব্বলতা বা রোগ অথবা কোনও বিপত্তিকর ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতীকারের জন্য সংযম আবশ্যক, তাহা হইলে স্ত্রীরা মাথা-কপাল কুটিয়া হইলেও স্বামীকে সংযত থাকিতে বাধ্য করেন। কেবল চিকিৎসকেরা বলিলেই নহে, অনেক সময়ে একজন পুরোহিত বা গ্রহাচার্য্যের মুখে কোনও নির্দ্দেশ পাইলেও স্ত্রীলোকেরা ইহা করেন,—পরমারাধ্য দীক্ষাদাতা গুরুর মুখ হইতে শুনিলে ত' কথাই নাই। স্ত্রীরা যখন পূজা-পার্ব্বণাদি উপলক্ষ্যে ব্রতোপবাসাদি করেন, সেই সময়ে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইলেও কোনও স্বামীকে অসংযমে রত হইতে তাঁহারা দেন না। তদুপরি স্ত্রীলোকের শারীরিক ধর্ম্ম বশতঃই মাসে মাসে কয়েকটা দিন তাঁহাদের স্বামীদের যথেচ্ছ আচরণের অনুপযুক্ত থাকেন। এই কারণে বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে অনেক স্থলেই পরিমিত স্ত্রীসঙ্গ অসম্ভব হয় না।

কিন্তু অবিবাহিত ব্যক্তি যদি শুক্রক্ষয় করিতে শুরু করে, কে তাহাকে আসিয়া সংযত হইবার সাহায্য করিবে? অভ্যাসের দাসত্ব তাহাকে দিনের পর দিন কেবলই বেপরোয়া করিতে থাকিবে। যখন সে বুঝিবে যে, তাহার শরীর ইহাতে সত্যই খারাপ হইতেছে, তখনও সে নিজের দুষ্কার্য্যের ঝোক

সামলাইতে পারিবে না। সে তাহার কুকর্ম্মের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যত কমাইতে চাহিবে, নেশায় অন্ধ তাহার মন থামিয়া যাইতে ততই নারাজ, ততই অক্ষম হইবে। পরিমিত শুক্রক্ষয় যুক্তির দিক্ দিয়া যতই নিরাপদ বলিয়া মনে হউক, কার্য্যকালে কখনো তাহা সম্ভব নহে। যে একবার শুক্রক্ষয়রূপ পাপে নিজেকে আসক্ত করিয়াছে, সে আর সীমা ঠিক রাখিতে পারে না, অন্ধের মত প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেকে সে কেবল ধ্বংস করিয়াই যাইতে থাকে। সুতরাং এই জাতীয় কুযুক্তির প্রতি কাহারও কর্ণপাত করা উচিত নহে।

এই বিষয়ে আরও একটা গুরুতর দিক ভাবিবার আছে। অকালে শুক্রক্ষয় যাহারা করে, দাম্পত্য জীবন যাপন-কালে তাহাদের কেহ কেহ দৈহিক দিক্ দিয়া বড়ই অযোগ্য হইয়া থাকে। দৈবাৎ দুই একজন দাম্পত্য কর্ত্তব্য শারীরিক ভাবে অবাধে পালনও হয়ত করিয়া যায় কিন্তু তাহাদের স্ত্রীদের প্রতি অন্তরের তীব্র কোনও আকর্ষণ অনুভব করে না। অনেক সময়ে নিজ স্ত্রীকেও তাহারা কেবল ভয়ের সামগ্রী বলিয়াই মনে করে। অনেক সময়ে স্ত্রীকে খুশী রাখিবার জন্যই স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় কিন্তু স্ত্রীর প্রতি নিজের প্রবল অনুরাগ বা প্রগাঢ় প্রেম অনুভব করিতে না পারিয়া মনে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও অনুতপ্ত হয়। ইহার ফলে দাম্পত্য জীবনের সুখ বহুল পরিমাণে খর্ব্বিত হইয়া যায়। পুরুষ তাহার শুক্রক্ষয়, শুক্রক্ষয়ানুকূল কার্য্য তার

স্ত্রীকে লইয়া করিবে, একা করিবে না, ইহাই ঈশ্বরের বিধান। স্ত্রী-পুরুষের ভিতরে অপার আকর্ষণকে সৃষ্টি করিয়া রাখিবার ইহা এক অতি প্রধান কারণ। আসল ব্যাপারে পদে পদে হতমান, হতাশ ও অপূর্ণকাম থাকিবার জন্য অবিবাহিত অবস্থায় তোমরা নকল ব্যাপারে শক্তিক্ষয় করিয়া জীবন-ব্যাপী আত্মবঞ্চনার পথ প্রশস্ত করিতেছ। যে সকল যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া তোমরা চলিতে চাহ, সেগুলি কুযুক্তি বা মিথ্যা যুক্তি। ইহা স্পষ্ট মনে রাখিও।

(১৮)

জীবনের সংগ্রাম-মুখরতা দেখিয়া ভয় পাইয়া যাইও না, বরঞ্চ বিশ্বাস কর যে, সংগ্রামের প্রখরতাই ত যুদ্ধ-জয়কে শ্রেষ্ঠ কৌলীন্য দান করে। তুমি সংগ্রামে জয়ী হইবার যোগ্য বলিয়াই সংগ্রাম তোমার সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লক্ষ্যে যদি একনিষ্ঠ থাক, কাহার সাধ্য আছে তোমাকে পরাজিত করে? তোমার জীবনের লক্ষ্য তোমার যোগ্য হউক, এই লক্ষ্যকে লাভের জন্য শক্তির সাধনা তোমার তীব্র হউক, সহস্র বিপত্তির মধ্য দিয়াও শক্তিসঞ্চয় করিয়া তুমি দুর্ধর্ষ হও। মনে রাখিও, তোমার জীবন-পথে অধিকাংশ কণ্টক নিতান্তই কাল্পনিক, আত্ম-অবিশ্বাস আর অন্তরের ভয় তাহাদিগকে বাস্তব করিয়া তুলিতেছে। হয় মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পাতন,—ইহাই তোমার লক্ষ্য হউক। বারংবার হারিয়া গিয়াছ

কিন্তু চূড়ান্ত দিগ্বিজয় যে তোমারই পৌরুষের প্রতীক্ষা করিতেছে। কর্ত্তব্য-পালনের আত্মপ্রসাদ আর আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা লইয়া পথ চল,—সব কণ্টক নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তুমি যুবক, যৌবনের গর্ব্ব তোমাতে থাকা চাই। কেন তুমি বৃদ্ধের মত হতাশ হইবে, কেন তুমি শিশুর মত অবোধ থাকিবে ?

(১৯)

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি তোমাদের বিরক্তির কারণগুলি হয়ত বুঝিতে পারি কিন্তু যুক্তিগুলি বোধগম্য হয় না। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলেই একজন সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া নিতে হয়, যিনি বিশ্বতোচক্ষু বলিয়া সকল স্থানের গুপ্ত ও প্রকাশ্য ব্যাপার দেখিতে পান, জানিতে পারেন। একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই তাঁহাকে জানিবার, বুঝিবার, পাইবার যে কতকগুলি সদুপায় আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। আবার ইহা স্বীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হয় যে, কেহ কেহ এই সকল সদুপায় অবগত আছেন, কেহ কেহ ইহা জানেন না। সুতরাং একদল লোককে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়া অপর দল লোক নিজেদের স্বাধীন বিচার, স্বতন্ত্র বুদ্ধি, ব্যক্তিগত সামর্থ্যে সত্যলাভের যোগ্যতা বিসর্জ্জন দিয়া গুরুভজায় পরিণত হয়। ইহাই তোমাদের যুক্তি।

কিন্তু ইহা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা কি খণ্ডিত হইল ?

ঈশ্বর মান আর না মান, ব্রহ্মচর্য্য তোমার প্রয়োজন। তবে, ঈশ্বর মানিলে এবং ঈশ্বরের ভজনশীল হইলে তোমার মনের যে প্রশান্তি হইবে, তাহা তোমার ব্রহ্মচর্য্যকে সহজতর করিবে, এইমাত্র। গুরু মান আর না মান, ব্রহ্মচর্য্য তোমার প্রয়োজন। তবে গুরু মানিবার মত যদি তোমার মনের গঠন হইয়া থাকে, আর আত্মদর্শী সদ্‌গুরু যদি পাইয়া থাক, তবে তাঁহার নিষ্কাম নির্ম্মল নিষ্পাপ মনটীতে নিজ মন সংলগ্ন করিলে তোমার ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধিলাভের অধিকতর আনুকূল্য হইবে। এগুলি পরীক্ষিত সত্য। যাহা সত্য, তাহাকে যুক্তির কামানে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে।

(২০)

ধর্ম্মভাবে প্রেরণা দিলে মানুষের মন পঙ্গু হয় না, হয় বলীয়ান্। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমত মানুষের মনকে নিজ স্বার্থের প্রতি রুচিহীন করিয়া পরের সুখ, পরের শান্তি দেখিবার প্রেরণা দিয়াছে। প্রতিবেশীর প্রতি উৎপীড়ন না করিয়া সুবিচার ও সদ্বিবেচনা করিবার প্রেরণাই পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম দিতেছে। চিন্তার বিস্তার বা সমবেদনার পরিধি সকল ধর্ম্মমতের সমান না হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মই অল্পবিস্তর নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থব্রতিত্ব তাহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীতে যদি কোনও ধর্ম্মমতের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে মনুষ্য-

থাকে, তখন তাহার সুখ-সম্পর্কিত ধারণা তথা আস্বাদনগুলিও সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর হইয়া যাইতে থাকে। একটা পশুর পক্ষে কাল যাহা সুখ ছিল, আজও তাহাই সুখ। একটা পক্ষীর পক্ষে আজ যাহা সুখ দেখিতেছ, কালও তাহাই তাহার সুখ থাকিবে। যৌবনে পশু বা পক্ষীরা যাহাকে সুখ গণনা করিয়াছে, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে তাহাকেই সুখ বলিয়া জানে। সাধারণ মানুষের পক্ষেও এই কথাই প্রযোজ্য কিন্তু ক্রমবিস্তার-শীল মানুষের রীতি আলাদা। ক্রমশঃ বৃহত্তর সুখকে আস্বাদন করিতে করিতে সে এমন সুখে গিয়া মজে, যাহার উপরে সুখ নাই, যাহাকে শাস্ত্র বলিয়াছেন ভূমা, যাহাকে তত্ত্বজ্ঞ জানিয়াছেন ব্রহ্ম। এই সুখ যেদিন লাভ করিবে, সেই দিনই তুমি ব্রহ্মচারী হইবে। এই সুখ লাভের গতি-পথ সুগম করিবার জন্য এবং পথ-গতি দ্রুততর করিবার জন্য তোমাকে বীর্য্যধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে।

(২২)

নিজে মহৎ ও শক্তিশালী হইতে হইলে অপরকে মহৎ ও শক্তিশালী করিবার জন্য প্রয়াসী হইতে হয়। গুরু যে শিষ্যকে উপদেশ দেন, ইহাতে কেবল শিষ্যেরই হিত হয় না, গুরুও প্রত্যক্ষ ভাবেই লাভবান্ হন। নিজের ভিতরে গুরুগিরির ভাব না রাখিয়া তোমা অপেক্ষা দুর্ব্বলতর ব্যক্তিদের মধ্যে বলবত্তা বর্দ্ধনে চেষ্টিত হইবে। চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত পড়ুয়ারা

ত্রিশ, চাল্লিশ, পঞ্চাশ বা একশত জন কি করিয়া একটী মাত্র অধ্যাপকের কাছ হইতে পাঠ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? মধ্যের ছাত্রেরা আদ্যের ছাত্র-দিগকে পাঠে সাহায্য করিয়াছেন, উপাধির ছাত্রেরা মধ্যের ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন। এইভাবে প্রত্যেকে নিজের নিজের নীচের শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে নিজ নিজ বিদ্যাকেই পাকা করিয়া থাকেন। যিনি আদ্য পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে কি আদ্য-পাঠ্য-তালিকার অধীত সকল বিষয় তাঁহার মনে আছে? না, সবই মনে রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব? অনেক কথাই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন পুনরায় আদ্যের ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া সেই বিস্মৃত বিষয়-সমূহ তাঁহার মনে পড়িতেছে, অধীত বিদ্যাই নূতন করিয়া আয়ত্ত হইতেছে। মানুষ একবার যাহা মন দিয়া পড়ে, তাহার সবই কি তাহার মনে থাকে? থাকিলে বিদ্যাদিগ্‌গজ হইবার জন্য এক এক জন লোকের মাত্র কয়েকখানা বহি পড়িলেই জীবনের কাজ হইয়া যাইত। একজন এম, এ, পাশ করা অধ্যাপকও "চাইল্ডস্‌ ঈজি গ্রামার" খানা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এত বড় বিদ্বান্‌ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার এই ক্ষুদ্র বহি-খানার মধ্যেও অধীত কিছু কিছু বিষয় বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গিয়াছে, যাহা পুনরায় পাঠ করাতে নূতন করিয়া

আয়ত্ত হইল। টোলের ছাত্রেরা নীচের ছেলেদের পড়াইতে গিয়াই পাকা হন, এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, অপরকে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী ও আত্মগঠনোৎসাহী করিতে চেষ্টা করিয়া নিজেরও আত্মগঠন দ্রুততর হয়। তবে বিনীত সেবকের মন লইয়াই এই কার্য্যটী করিবে। গুরুগিরির অহমিকা যদি মনে আসিয়া যায়, তাহা হইলে অপরের ভাল করিতে গিয়া নিজের পায়েই তুমি কুড়াল মারিবে।

(২৩)

কৈশোরে ও যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেই ছেলেরা সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, এইরূপ একটা অতিশয় যুক্তিহীন ধারণা অভিভাবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। অভিভাবকদের এইরূপ ধারণা পোষণ করিতে দেখিয়া তোমরাও তাঁহাদের মত ভাবিয়া থাক। কেহ ভাবিয়া থাক, সন্ন্যাসী যখন হইব না, তখন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কি হইবে? কেহ ভাবিয়া থাক, ব্রহ্মচর্য্যই যখন পালন করিতেছি, তখন সন্ন্যাসীই হইয়া যাইবে। তোমাদের এই দ্বিবিধ ভাবনাই নিতান্ত অনাবশ্যক ও অবান্তর। কেননা, উপযুক্ত বয়সে সদ্‌গৃহী হইবে বলিয়াই যে তোমার ব্রহ্মচর্য্য, ইহা শাস্ত্র-বচনে ও ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গে অলোপ্য-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। "যদহরেব বিরজেৎ

তদহরেব প্রব্রজেৎ,—যখনই বৈরাগ্য আসিবে, তখনই সন্ন্যাসী হইবে",—বলিয়া যে নীতি রহিয়াছে, তাহা শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ দুই চারিজন মহামানবের সম্পর্কেই চিরকাল প্রযোজ্য হইয়াছে। তোমাদের প্রতিজনের সেই বিষয় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই।

আর সন্ন্যাস কি একটা পেশা, না অবস্থা? সন্ন্যাস মানে কি গৈরিক ধারণ করিয়া ভিক্ষাটন, না একটা অত্যুন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়া সেই অবস্থার অনুযায়ী-ভাবে বিশ্বজনের মঙ্গল-সাধন? ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতী প্রভৃতি যেমন কেহ কাপড় কাচিয়া, কেহ দাঁড়ি চাছিয়া, কেহ লোহা পিটাইয়া, কেহ মাটি ছানিয়া, কেহ নৌকা বানাইয়া, কেহ ঠক্‌ঠকি তাঁত চালাইয়া জীবিকার্জ্জন করেন, সন্ন্যাসীরও কাজ কি ছোবান কাপড় পরিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া দুই চারিটি শাস্ত্র-বচন বা বেদান্ত-বাক্য বলিয়া অন্ন, অর্থ ও জীবিকা অর্জ্জন করা? এই প্রশ্নের উত্তর তুমি তোমার নিজের কাছ হইতে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহা হইলেই তোমার ব্রহ্মচর্য্যে ভীতি প্রশমিত হইবে।

(২৪)

মনুষ্য-জীবনে বার্দ্ধক্য যত জনের পক্ষে সত্য, যৌবন তাহার তুলনায় অনেক অধিক লোকের পক্ষে সত্য। যাহারা বৃদ্ধ হইবার আগেই দেহ ছাড়িয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কম

নহে। বার্ধক্য পর্যন্ত পরমায়ু লইয়া কয়জনে পথ চলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য এখনও তোমাদের নাগালের বাহিরে কিন্তু যৌবন একেবারে হাতের মুঠায়, ইহাকে বৃথা যাইতে দিও না। বলবীর্যে দুর্ধর্ষ মনুষ্যত্ব লইয়া তোমরা পৃথিবীর বুকে নূতন ইতিহাস রচনা করিবার দুঃসাহস একবার প্রদর্শন কর, আমরা যৌবনের জয়-গান গাহিয়া ধন্য হই। তাহারই আশায় বারংবার প্রচার করিতেছি, ব্রহ্মচর্য কর এবং করাও।

(২৫)

জীবনের পরম লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন। জীবনের পরমা শান্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে। পরমেশ্বরকে আত্মময় দেখিয়া নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডময় দর্শনই ভারতীয় জীবনের পরম পুরুষার্থ। পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষেই যখন জন্মিয়াছ, তখন এই বিরাট সৌভাগ্যকে আয়ত্ত না করিয়া জীবন-ধারণকে সার্থক বলিয়া মনে করিও না। ভারতীয় জীবন সম্পর্কে ইহাই চূড়ান্ত অধ্যায় বলিয়া ভারত তাহার জীবনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্যকে স্থাপিত করিয়াছে। ভারতের সন্তান! দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় নিজেকে অপথে বিপথে পরিচালিত করিয়া নিজের নিকটে নিজে হাস্যাস্পদ হইও না।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—